পথের পাঁচালী

বল্লালী-বালাই

পথের পাঁচালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই দ্যাখো!

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙ্গিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়া ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাক্‌রুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে; চলে আয় বল্‌চি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রামে যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প-বয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুরবেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন—কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন, তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্প বয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পর শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায়

অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরাটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজী ধরনের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুতে পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিকে ওদিকে জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন, কিন্তু কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্‌পী-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়েসে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ি তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির মত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও তুমি রাজু...

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল। ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোকের সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে। তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন। পৌষ-পার্বণের দিন ঐ ঢেঁকিশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য--চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায়বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকিতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা হাতে একবার সামনে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর ঐ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন।

রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোঁজখবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে, কতদিন না খাইয়া প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখ-দুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই সে খুশী, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। জল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে।

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুটি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?....তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা।

এ রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে-বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূর্বের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আল্‌নায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলি খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেঁট্‌রাটার মধ্যে একটা পুঁটলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর; একটা পিতলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়। পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু নুন, কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ

এ-গল্প ও-গল্প শুনিবার পর খুকি বলে,—পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়েসে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, সেইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চূড়োবাঁধা এক-মিন্‌সে।—'মি' অক্ষরটার ওপর অকারণ জোর দিয়া ছোট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনের দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

পথের পাঁচালী **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকাল গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান—লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধার দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মরিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাশ গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট্ হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিকমাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন, যে তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিন্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিন্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যাথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠান্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাংলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধবলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্‌চক্ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুট্‌পাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমুহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজা-খুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেমন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠকিয়া শিখিলেন যে সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দন্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা-তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হৌক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসীমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া-শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুডুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খুকী খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠান্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েছে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়াল ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে....ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পারে সে অবাক হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হলো, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছা সত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকমের কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথায় চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন' দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাহাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কপাটটা এক এক দিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে।

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটী আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগগাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহ'লে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়কির পিছনে বাঁশবনের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ—এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আমবাগান ও ঝুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগের কথা সব।

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে বলিল, ওলা—চিনির ডেলার মত। ঘটীর জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরবাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজকাকার চন্ডীমন্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজে পত্তরখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে হয়—ন-জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দির? তাহার পর ইন্দির ঠাক্রুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈঁছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিন্দুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের!...

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ! ষোল বৎসরের বালক, কি টকটকে গায়ের রং কি চুল! ঐ সে চন্ডীমন্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাশুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃবধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিনী, রন্ধন করিয়া আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্ন-বিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাশুরের কথায় মনের কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল—তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

জল খেতে নেই, ছিঃ, বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে—এক ঢোঁক খাই মা—পায়ে পড়ি...

দুপুরের পাখপাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে—পিতি, তোর ঘুম নেগেচে? আয় শুবি চল্।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই দ্যাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেছে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি—নিয়ে আয় দিকি ঐ বড় আগালেড়া?

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটা বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে-জে-জে-জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না-না-না-না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরো কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে কে এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে হাসবি কি করে শুনি? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া একমুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, জে-জে-জে-জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা খল্‌বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পালাইতে যায়, এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে— খোকন বলে টু—উ—উ! দোলা তো খোকা' দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই
জে—জে—জে—জে—এ
জে—জে—জে—জে—জে—জে

তার মা বলে, আচ্ছা থামো আর দুলো না খোকা, হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়াগড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে....ধরো দিকি একটু! আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার প্যাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চুড়ই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পর একটিবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাইরের দরজায় দাঁড়াইল, এবং তাহার সহিত চোখাচোকি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মট্‌কা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত-পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহর প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—ব'সো এখানে, ভাল আছো?

সর্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা, কি বলে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল—কেন, কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্তায় আজ পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্টি বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছকয়েক কড় ও কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরিব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে। সর্বজয়াও চাহিয়া চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে ছিল। আজ সারাদিন সে চারি-পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপমায়ের কথাবার্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক হইতেও

দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে—আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই—সকলেই আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবড়ালে নির্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপমায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিনবো কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

—আন্দাজে—

—আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি! দেখলে না, তখুনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বল তো, আমায় চিনতে পেরেছিলে? বল তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীণার বিয়ে কোথায় হল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

—তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী।—সেই মধুমতীর ধারে।

একটা প্রশ্ন বার বার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকীর পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালই কেন? এ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন? বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ী তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল?...

—এই গাঁয়েই বাড়ী—এ পাড়ায়, আমার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েচে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেচে যে—

কথাবার্তার স্রোত একইভাবে চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধ্যানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্ব্বর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে!

রাত-জাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ

বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গিয়াছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে? কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?

দুজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা?

পথের পাঁচালী — পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকুরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তার আরও মনে হয় বুড়ী ডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ঈঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভান্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে ভান্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চন্ডীমন্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাড়ী? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—কে রাধু? জিগ্যেস্ করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন—না-হাসি-না-দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল—তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি—আর কড়া দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভূবনে—এই বয়সে দুটো ভাত কাপড়ের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বড়ছেলেকে গাড়ীর দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়ীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রপধূ আছে। নাতি-নাতিনীও তিন-চারটি।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া উঁচু আটচালা ঘর জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জলখাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিমা, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধূলো দ্যাননি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে? পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া

বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলচি আলাদা বসবি—এই উমি, বড্ড বাড় হয়েচে, না?

কিন্তু দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল, বুড়ীর সব কেমন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমনি স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয় এ ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকী-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ী যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্ত্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ীর বড়বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্ধানে খুশী ছাড়া অ-খুশী হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড়ছেলে ও বড়বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ীর ঘুমের আমেজ আসে।

খুকী প্রথমে ভারী অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে না। নানা কথায় সান্ত্বনা দিবার পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ী ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে,—বেশ লাল একজোড়া ঢেঁকি ঝুমকো হয় তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—ওগুলোকে বলে কি ছাই—

শীত আসিল। বুড়ী—ও পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া বুড়া রামনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলিল—ও রাম, জাড় পড়লো বড্ড আবার—তা গায়ে একখানা বস্তর এমন নেই যে, সকালসন্দে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—

রাম গাঙ্গুলী বলিলেন—আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে বরং দেখবো।

বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোরা-ফেরার পরে একদিন কুষ্টিয়ার রাঙা ছিটের সূতী চাদর একখানা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, ভারি গরম জিনিস—সাড়ে ন' আনা দাম—এর চেয়ে ভাল জিনিস আর নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—বুধবার এনে রেখেচি—দ্যাখো না খুলে?

বুড়ীর তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া গায়ে জাড়াইয়া বলিল—দিব্যি, কেমন ওম্—মোটা-সোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা, বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙ্গাল গরিবকে কেউ দেয় না, ওই অন্নদার কাছে একখানা গায়ের কাপড় চাচ্চি আজ তিন বছর থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—সখটা মিটিয়ে নি, কডা দিনই আর বা?

সর্বজয়াকে আহ্লাদ করিয়া দেখাইতেই সে বলিল, দ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ি থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বান্দোবস্ত করো—

বুড়ী সে কথা হজম করিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করিতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল—

দুর্গা ভারি খুশী হইয়া বলে, ক' পয়সা দাম পিতিমা—কেমন নাঙা—না? আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ের দিস্ বড় হলে। নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারি উপাদেয়, ভারি শৌখীন বলিয়া মনে হয়। সকালে চারখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চলতি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, কে যায়? রাজীর মা?—এত বেলা যে? ভূমিকা আর বেশী দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও-পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন' আনা দাম—

দু' একটা দুষ্ট মেয়ে বলে—উঃ, ঠাক্‌মাকে রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে। ঠাক্‌মার বুঝি বিয়ে!

ও পাড়ার দাসীঠাকরণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দুটোর জন্যি এয়েছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে, কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে? দাসীঠাকরুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে! সকালবেলা কি মিথ্যা বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক দু'পয়সাতেই —

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল যাহা কিনা এত অপর্য্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে গরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি হইয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচ, যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিঁই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খৎ কানে খৎ, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনো হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সা দুটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু খুকী বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেছে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, তোমায় আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বুঝি গাছ আছে পিসি?—পরে সে ডাকিয়া কহিল—শোনো না দাসীপিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে নুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি।

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডানহাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরোনো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি, যাস্‌নে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। তুই চলে গেলে আমি কাঁদবো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনখ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো? ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?...

বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, হ্যাঁগো বুড়ী? তা থাকো তুমি, এইখানেই থাকো। মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ী সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ার পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিনমাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ও-পাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু'একবার গেল, খুকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পুব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ির জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে। যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা কেন সেদিন অত উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদলে, হাত ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখও ছিল অদৃষ্টে—আজ যদি মেয়েটা থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ সন্ধ্যার পরে একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

—পিসিমা!....বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চকত্তির মেয়ে রাজী। খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দেবেলা চুপি চুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই দ্যাখ্ তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকী পুঁটুলি খুলিল—

—মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দুটো কদ্‌মা আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—। বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মাণিক, কত জিনিস এনেচে দ্যাখো। রাজরাণী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া। দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা! বাঃ দিব্যি পুতুল—কড়া পয়সা নিলে?....

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?

—সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার

গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবশ্যি করে বাড়ী যাস্—সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বল্লে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি ব'লো তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না—

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বলবে না—তা'হলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে? কাল সকালে ঠিক যাস্ কিন্তু।

সকালে উঠিয়া বুড়ী দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকরুণ তা বাড়ী যাচ্ছে বুঝি? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েচে বুঝি?

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল—কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে, বল্লে, মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বল্লাম—আজ তুই যা, সকালে বেলাডা হোক, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!....তাই সকালে যাচ্ছি।

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সারারাত জ্বর ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্ব্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ায় পৈঠায় বলিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কী দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল, বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বৌ, ভাল আছিস্? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?

তার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ?

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিসনে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

—ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে আমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নৈলে অনথ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইয়া আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনোরকমে দিতে পারবো না—

বুড়ী পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান-ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন-চার মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—আর সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই।

চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল—ঠাক্‌মা, ফিরে

যাচ্ছো কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল—ঠাক্‌মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল—ও মা-ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একেবার পাঠিয়ে দেও না!

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাকরুণ মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এইখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সামলে উঠবে এমন, ভির্‌মি লেগেচে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভিরমি্‌ নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না, হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূর আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। দ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—ও পিসিমা।

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুস্থ মনে হচ্ছে? পরে সে গঙ্গজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পর চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুণ কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন মধ্যবয়সী, পুরদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়েদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্যসেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙ্গে-পটলের দর-দস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে-ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুর্ণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার

বনে রাতকাটানো, শাহ্ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলালেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ, উচ্ছল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অব্‌ধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক্—পূব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্ দিচ্ছে, রোজ দেড়মণ দু'মণ এইরকম পড়চে—পাঁচ-সেরের নীচে মাছ নেই। শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে।

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকার ওপরে সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলু-খড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ঐ গেল বাবা, বড় বড় কান ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উঁহু উঁহু উঁহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা?

হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি! শূওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

— শূওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল চল—হ্যাঁ—আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি!....

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ।—জীবন্ত!—একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়;—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ। এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে!—জল-মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাব্‌লা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইঁটের পাঁজার মত জিনিস পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সারনের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্‌ লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস জঙ্গলাকীর্ণ ইঁটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবল-প্রতাপ লারমার সাহেবের নামে একসময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভুমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দেয়, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রি হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরকস্তুর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা?

—এই দেখো এখন, বাব্‌লাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাব্‌লাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কূল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকুষিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কী হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠলে জ্বর থেকে আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নেই! কটা কুল খেয়েচিস্‌, দেখি মুখ দেখি?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মত গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কক্‌খনো খেও না যেন খোকা! তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেও; লুকিয়ে লুকিয়ে কক্‌খনো আর খেও না—কেমন তো?

হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ঐ দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ন তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্‌নের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহনা হইতে জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা, বড়জোর রাণুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিত—আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা। ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লকাঁর দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিও না—আলকুশী আলকুশী। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখছি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।

—হাত চুলকুবে কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আলকুশীতে কে হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু।

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশীর ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন, হোল তো কুঠির মাঠ দেখা?

পথের পাঁচালী — অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা । আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশী, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া

লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতুহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নড়াচড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপড়াগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও—অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,—কি রে?

দুর্গার হাতে নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসী জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

—তুই যা না শিগগিরি করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শীগগির যা—

অপু বলিল—নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো—তুই খিড়কী দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কিনা।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলি বুঝি হোল? এই তো—ভারি বেশী—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

—তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আন্‌বো এখন—পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটী যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোন লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকছে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা একটান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে...

পরে দুর্গা নিরীহভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে।

—রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু....একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবানো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগ্যেস করো না? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘুমুচ্ছে।

—দুগগা বুঝি—

—সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—সে বাড়ী থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক। আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে—এত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদাঠাকুর আমায় চিনতে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম—না বাপু, আমি তো কৈ—? বল্লে—আপনার কর্তা থাকতে তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়েই তিনি আসতেন, পায়ের ধূলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোন কথা বলব না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগো, তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর? কি জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—ব'লো না কাউকে।—সদ্‌গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

—আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদগোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়—আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকুরণ বল্লে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে—তবে তুমি অনেক করে বল্লে—বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্চে, দুবেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে। ছেলেটার কাপড় নেই—দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

—আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা-জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই। আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরাই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এখখুনি। তা তুমি রাজী হলে না কেন? বললেই হত যে আচ্ছা আমরা আসবো। ও-রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কে? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজী হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখছি শিকেয় উটেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ বল্লেই কি ওঠা চলে? সব বেটা এসে বলবে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌না রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার....ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুকুচুক কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশীর সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথের পাঁচালী — নবম পরিচ্ছেদ

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইল না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মা'র মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দুরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়ের মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দুরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দুর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটি হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—দ্যাখো দ্যাখো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস সকড়ী হাত?....ছাড়ো মাণিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্য এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করো না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা। অপু বলিত, মা সেই ঘুঁটে কুড়ানোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটে কুড়োনোর কোন্ গল্প বল তো—ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়ে সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন।।
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ, বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানলার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশু হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম, তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে আশাহত, ব্যর্থতায় বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দুরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে—সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দুরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে—রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ। বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডালকে অস্ত্ররূপে হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি,একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে। তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধ'রা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না। মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দূর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে

হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ও কি রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। পরে চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগল, আপন মনে কি বক্‌চিস্ বিড়্‌বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়ছিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাইএর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল! কোথাকার একটা পাগল, কি বখছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ····বক্‌ছিলাম বুঝি?····আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে····

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস?····কত নোনা পেকেচে?····এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি?

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুষিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুষি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি—

অপু আঁকুষি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশী পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচুগাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুষি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আন্‌বো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুষিটা নে। নোলক পর্‌বি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমী লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয় নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, নোলক তাহার দরকার নেই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছুই বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে, কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েছে, চল মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল না—খুলে ফেলিসনে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দ্যাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্‌তে তো পারচি নে?—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগী বাজচে, চল্, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শীগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-

পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আমার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আমার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতে বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু। ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর, যেমন মা তেমনি ছা—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস্ রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আর আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

পথের পাঁচালী **দশম পরিচ্ছেদ**

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল; পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ী হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি? ঘরকন্নার কাজ-কর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ও-বেলা ক'রো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি!

—খাওনি তো করবো কি? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাব। বসে তো নেই? যা ও-রকম দুষ্টুমি করিস্ নে—তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুন্‌বো না····করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল—ও রকম দুষ্টুমি করো না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁজল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল দিকি?

ঘণ্টাখানেক পরে অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্লাস তুলিয়া সে ঢকঢক করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকি জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

—কৈ খাচ্ছিস কৈ? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হ'লেই হোয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ীতে ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলা-ধূলা নাই—কোথায় কোন্ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্টি—এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও কন্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপ্‌রা লইয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌খানায় ভাল তাক হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে! এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর এত বড় ধাড়ী মেয়ে—দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি দ্যাখো না। না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ দুলে-বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধন্‌দৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়কাকাদের বাড়ীর সাম্‌নে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবৌ তাই—

বেনেবৌয়ের কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভস্‌সো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন—আজ টান মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ঐ বাঁশতলায় ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে মুখুয্যের বাড়ীর সেজ-ঠাকরুণ, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ-ঠাকুরণ কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ীর কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্ হন্ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর্ পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ীর কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেল্‌তে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি, কি খুড়ীমা? কি হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই দ্যাখো না কি হয়েচে, কীর্তিখানা দ্যাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে— মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বল্‌লে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—দ্যাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই দ্যাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি হয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্ এই মালা ওদের বাড়ী থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন,—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেন, না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা তা তো বলিনি! আমি ওকে জিগ্যেস্ করচি।

সেজ-ঠাক্‌রুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিগ্যেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়সে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে! চল্ রে সতু— নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে। টুনু, মালা নিইচিস্ তো?

সর্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিন্তু পিছু হাঁটবার পাত্র নয়, বলিল—পুঁতির মালার কথা জানিনে, সেজ-খুড়ী, কিন্তু আমের গুটিগুলো সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজ-ঠাক্‌রুণ অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বল্‌চো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্ বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বল্‌তে পার? বলি টাকাগুলোতেই তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো—আস্‌বো এখন ওবেলা টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর রাখতে পারবো না—টাকার যোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবলসহ সেজ-ঠাক্‌রুরণ দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্বজয়া শুনিতে পাইল পথে কাহার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ীর ছুঁড়িটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে—আর দ্যাখো না এই

আমগুলো পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হোল—তাই বলতে গেলাম, তা আমায় আবার কেটে কেটে বল্‌চে (এখানে সেজ-বৌ সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? (সুর নীচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অম্‌নি হয়েচে? বাড়ীসুদ্ধ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল ভাত মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ্‌বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—ম'লে আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কী-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়া ছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মত থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ী, পট্‌লিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী—একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিল—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কী-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই। তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুক্‌নো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্‌ঝোলা হল্‌দে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বলে কিচ-কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়দের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়েছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনো মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মত দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহারও ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জন...কেহ কোনদিকেই নাই...নীলমণি রায়ের পোড়া ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘন সবুজ নতুন পাতা চক্‌ চক্‌ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটোছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেল্‌বো না রাণুদি,—দিদিকে দেখেচো?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি। বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই...যদি কোনো দিকে গাছপালার আড়ালে থাকে। সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলো বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানে তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হল না। বকুলগাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস্ খস্ শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ীর পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা। একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া। সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরি পর্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটলিদের বাড়ীর উঠান দিয়ে গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় রসিয়া গল্প করিতেছেন। পটলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আস্‌তে আস্‌তে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ী গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি— বোধ হয় এখনও বাড়ী পৌঁছয়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি! ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায় দুগ্‌গাকে বলিস—

তাহাদের বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও বেরোও—একেবারে জন্মের মতো যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্— একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এক রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোন কথা না বলিয়া সে কালের পুতুলের মত মায়ের কথামত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উস্কাইয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজী কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্‌টাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক পাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এস, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে রাজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না—তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে...পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হোল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস্?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না অমন করে কেঁদো না,—ঐ পট্‌লিদের কি নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও-পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছিঃ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আন্‌বেন। এখন—একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেছিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বৈকি! তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল।—না—সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড়

রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম—তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বল্লাম, ভাই, তুমি আমার দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

—থাকগে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙ্গা যা পেকেছে! এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি—মিষ্টি যেন গুড়—

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানে পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখী, ধানের শীষ, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল—দাঁড়া, এই মন্তরটা বলে নিয়ে চল্ এক জায়গায় যাবো।

—কোথা রে দিদি?

—চল না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ।

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা-মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও-রকম কচ্চিস্ কেন? যা এখান থেকে— তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী ভাই বোন্ ভাগ্যবতী, হি হি—ভাই বোন ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? মাকে বলে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল্ গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল্ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ীর চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এইখানটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ীর কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাসনি!—দূর—আশ-শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে! ও তো পাখীতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—দ্যাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদিরি কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক্ কেমন মিষ্টি বল দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্টি রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল রয়েছে অপু! দাঁড়া তুলচি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া বলিল—ধর অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুবজলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঐ ঝাঁকা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখী ময়না কাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাখা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিষ দিতেছিল। অপু চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী-টাখী এখন থাক্—ধর দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর করে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলো পানিফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্ তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির দিকে ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—দূর!

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে! গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্ট করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের দিকে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাখ্ কি এখানে!....পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণে মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে—কি জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিক ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চক্‌চকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ কর, চেঁচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে, মায়ের মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত, হলদে হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।....

সর্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিইছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—দ্যাখো দিকি কি এটা মা?

সর্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি করে জানলি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্ কচ্ছিল, এ ঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয় তবে দেখিস্ আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাকনির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হোলে?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনী কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধ হয় এক টুকরো হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্বজয় বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দ্যাখো তো এটা কি!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কি বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ্, না-হয় পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো? দুগ্‌গা বলছিলো মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে। যদি হীরে হয়?

হ্যাঁ, হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন! তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি? মজুমদারেরা বড়লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাহাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে!

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়! এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—হুঁ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেচেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে জহরৎ পাওয়া যেত তা হলে—তুমিও যেমন!

পথের পাঁচালী — দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাট্‌না বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস্ অপু—রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাতন কচ্চিস বল দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল; মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি-ভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—দ্যাখ দিকি কান্ড—কেন বাপু দিক করিস দুপুরবেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ঐ আমি দেখতে পেয়েছি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

—হি-হি-হি—আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা দেড়বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফর্সা ছিল। সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ড্যাগর চোখ দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রং-এর কম দামের ঘন্টিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয় রে পাখী—ই—ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোলা....

খোকা ট্যাঁপা-ট্যাঁপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট

পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত— ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো? তাই তো, দেখতে তো পাচ্ছিনে! ও খোকা!....পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্বজয়া বলিত— ওমা, কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেল কৈ দেখি, ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলা শেষ হইত না। সে তখন একেবারে আন্‌কোরা টাট্‌কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে। জগতের অফুরন্ত আনন্দভান্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মত বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায়? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভান্ডার ফুরাইয়া আসিত— সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত— সর্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত— ষাট ষাট— এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আস্‌চে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ-কাজলপরা কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত— কত রঙ্গই জানে সনকু আমার—তবুও তো এই যেটের দেড় বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা গাল দু'টি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাত ঢলিয়া আসিত, সর্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত— ওমা, সন্দেবেলা দ্যাখো ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবছি সন্দেটা উৎরুলে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবো—দ্যাখো কান্ড!....

সর্বজয়া জানিত— ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না। এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্ছিনে!....অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্বজয়া জানে যে, খেলার যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাকলো পড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ঐ রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখবে মজাটা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখগে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে! গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে দ্যাখ দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার যো আছে? যা তো লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

—হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কান্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাতরাজ্যির ধুলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ-মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে—

—হু-উ-উ-উম্ (পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

—নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল্—আমার বাট্‌নারহাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল—ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মাণিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার

চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সে **সামনের** ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ্ কিচ্ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধুলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেছিস? উঃ—ওই পুরানো থলেটার ধুলো! এক্কেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল; কিন্তু অপুর পরনে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গামছাখানা নে, ঐ দিয়ে ধুলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্। ছেলে যেন কি একটা!

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উসকোখুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আলতা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আম পেড়ে এনেচে ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা দ্যাখো, পায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে;— পুণ্যিপুকুরের জন্য ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল— ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ী থেকে আলতা বের করে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্‌কোখুসকো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুবড়ির আল্‌তা বৈকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালাম এক পয়সার; তার দরুণ দু'পাতা আল্‌তা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কল্‌কে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল—ঘন্টায় ঘন্টায় তামাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরীকাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাবো? পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে সুর নরম করিয়া বলিল—কি হোল?

—এই রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীসুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল, কিন্তু একটু মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ীর বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সে-ই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলছিল, তার কি হোল?

—এই নিয়ে একটু মুস্কিল বেঁধে গেল কিনা! ধরো যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও-কথা আর কি ক'রে ওঠাই?

সর্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোন জায়গায় দ্যাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে? এই দ্যাখো আম-কাঁঠালের সময় একটা আম-কাঁঠাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ী থেকে আজ দুটো আধপচা আম নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশ্যে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে দ্যাখে,—এ কি কম কষ্ট!

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি! বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা ফেলে-ঝেলে হোত, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ঐ বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন, আমাদের জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দুটো অত বড় বাগান রয়েচে, আম জাম নারকেল সুপারি—আপনার অভাব কি? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান! তা বল্লে কি জানো? বল্লে নীলমনি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি করে শোধ করে নিল। শোন কথা! নীলমণিদাদার বড্ড অভাব ছিল

কিনা, তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েছে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাততে! বৌদিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি!

—ভালমানুষ তো কত! সেও নাকি বলেছে, জ্ঞাতিশত্তুর—পর-হাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে? বৌদিদিকে—লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত ক'রে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে!....

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগগিরি ছোট্, তুই বরং সিঁদুরকৌটা-তলায় থাক্ আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়োর মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না!

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি! চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদিবা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বারবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটোছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ দিদি, কত ব'ড় দ্যাখ্—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেছিস টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও?—না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদের কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে ব'য়ে গেল—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়োবো

এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তেখাগী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্—। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়িপথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেককালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেককালের পুরানো গুলঞ্চ লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপ-জঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবু খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বৃষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বৃষ্টি এল!

—তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোল ভালই হোল—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

হুড়্-হুড়্—কড়াৎ....প্রকান্ড বন বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন-ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে! রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্-গুম্-ম্-ম্—চাপা গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিকে হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নাই, ভয় কি?—আর একটু সরে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েছে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক-একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলো জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্-কড়্-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে নাকি?—গাছের মাথায় বন-ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা....ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্-ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুর ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস্ ওদিকে?

আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হলো, ও মা, কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগ্‌লো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তা ভাত হয়েচিস্! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগান যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেচে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম প'ড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুলি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,—এই তো হোল নারকোল! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠান্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়কী-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজঠাকরুণ বাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন।

—এক মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া—মাগ্‌না তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার যো আছে! ঐ ছুঁড়ীটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?—ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়্‌দুড়্ দৌড়!—এত শত্তুরতা যেন ভগবান্ সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান্, উচ্ছন্ন যান্—এই ভস্ সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শীগ্‌গির যেন ছাতিমতলা সই হন—

সর্বজয়া খিড়কীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যেবাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরৎ দেওয়া হোল, তা কখনো লাগে?

বাড়ীতে পা দিয়েই মেয়েকে বলিল—দুর্গ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কীর দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল্ অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা ক'রে কুড়ুতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও। দোহাই ঠাকুর।

পথের পাঁচালী — **চতুর্দশ পরিচ্ছেদ**

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কেও বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল,

মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শীগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন লক্ষ্মী মাণিক!

মায়ের কথায় উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আসচিনে, দেখো!

—ষাট, ষাট, বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভাল করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই।—ওগো, তুমি গুরুমহাশয়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমহাশয়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে?—সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি ?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সেযাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা; ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ....

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে— কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিক-গ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্যাল মহাশয় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটুসমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন— এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেছ যে! ক'টা মাছি পড়লো!

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে—এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্ন্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক এক দিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিন্ড দিতে গিয়া পান্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্ন্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গায় গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্ন্যাল মশায় বার বার যে জিনিসটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিলেন একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী। অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরির মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ণ ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আস্‌তো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাক্‌দা থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল। তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীতি ছিল, তা রাজকৃষ্ণ ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল! আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক ষণ্ডামার্কোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধরে সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জে থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম

আর করিসনি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেছে, অমনি ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেছে গাড়ীর সঙ্গে! একেবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েছে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থৈ পায় না।

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও-পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও তবে শাঁখারীপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু ওল ও বন-কলমীর চক্চকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরু-মহাশয় বলিলেন—শেলেট নেও, শ্রুতিলেখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরু-মহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে তেম্নি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও 'সকল' কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

"এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চারমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়....পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া....।"

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ, —অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূর গিয়াছে; রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

সেই অশত্থ্ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে-দেখা-পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকন্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতিও তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখীডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ার নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ হৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাকরুণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন ঃ

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কক্ষনো দেখিনি রে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সম্‌ঝে চলি? সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় নাকি? না, কানে যায়? কার কথা কে শোনে! গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, রাদ্দিন পটের বিবি সেজে বসে আছে!—'পটের বিবি' জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাকরুণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাপু কখনো কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হয়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধ'রে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে—ক'রে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হোল, এমনি গায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ

দ্যাখে? তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার—কেন সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমার অদেষ্টে বেস্তর দুক্খু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্যে বলে বলে হয়রান—এই 'মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে?....সারা বছরের পিন্ডি জুটবে কোত্থেকে?

গোকুলের বউ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না ব'লে দিচ্চি—আমার বাবা কি করেচে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ী আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, থামুন, থামুন—পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকরুণও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল; পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন দা-ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে।

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—দ্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধরে বল্‌চি—আবার তেজডা দেখলে তো?—তোমার তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময় খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটিবাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গনগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটিবাটি জড় করা। বেঁটে ধরণের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নেই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে; পরনে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটিবাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকী?

সে বলিল—কিছু না, দেখবো।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল।

সর্বজয়া বলিল—গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয়! —আহা ভালমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

—আমাকে তো বড্ড ভালবাসে—যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হোল মা! সখী ঠাক্‌মা আবার এখন উলটে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটিবাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া। বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুকী?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—আমাদের ভাঙা ঘটি-গাড়ুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালমানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে সারাচ্ছে—

লোকটা তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে!—রাধে গোবিন্দ! সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর! রাধারাণী-পদ ভরসা!....নারকেলের কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে!—আধকাঠা-খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপদ্রুতে—একেবারে মূলশেকড়-টুলশেকড় সবসুদ্দ....কটা টাকাই মাটি।

মুখুয্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পিতলের ঘড়া বিনামূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কান্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)।

—পরিপুন্নু—আজ্ঞে পরিপুন্নু—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুয্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁ! এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে অমনি কার্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুয্যে মশায়ের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনো সক্কাল বেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—ঘড়াটা রেখে যান্—বাড়ী গিয়ে পহা কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব রাজী। দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু ঘটিবাটি ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভাল লোকটা তো! আসচে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস্ তাকে আসতে—আমাদের এখানে দুটো ডাল-ভাত পেরসাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে, সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—আসিলেই ভাঙাচোরা বাসনগুলো সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে—আর কোথায়ই বা তাহার ভাই! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁশিয়ার লোকের এক টুকরো পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পর সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়! বলে—একবার তোর রায় জেঠামশায়কে গিয়ে বল তো! ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি!....হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু?—চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিও না যেন!....এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণে কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে? সে যখন বাহির দরজার পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মধ্যখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গন্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুক দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল....আতুরী ডাইনীর বাড়ী!....সন্ধ্যেবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীর কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল....বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে....অন্য কেহ

নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনী তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!....

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচকাইয়া তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণ সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?....পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতি এস—আমচুর দেবানি এস—

এখন সে কি করে!....উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহারা প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রিল! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে....বাড়ী, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ....আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক!....

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব সে প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে!....

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে—ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমনপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু-চারখানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ভাজা কৈ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি—ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো—

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে! সে বৈকালবেলা বাটীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ ক'রে আস্‌চে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা ক'রে ওকে দে তো দুগ্‌গা।—ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াসুদ্ধ বাটিটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি—আমি কখ্‌খনো তোমার বাড়ী আর আস্‌চিনে—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল ভাল জিনিস খাবে? আমি আস্‌বো না তোমার বাড়ী, কখ্‌খনো আস্‌বো না—।

পরে সে আতুরী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা—একেবারে পাগল মা, কেমন বল্লে—পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা—ও অপু, শুনে যা ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে; বাঁশবনের তলাটা ঝোপেঝাড়ে নির্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়খড় শব্দ, অদূরে সলতেখাগী আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্খনো বাড়ী যাবো না তো!—এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সল্তে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাবে, কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ করে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয়-ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রাণুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই অত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রাণুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে মা!....এই দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো।

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোসাঁইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতাদুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি, দিদি, দ্যাখ দ্যাখ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তা ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কি ক'রে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি! কে বলেচে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসব কি ক'রে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বল্‌বো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডীহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে— হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিন বার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ

বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায়, ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায় কেন? পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে?....সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও দু'ঘন্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি ব'সে থাকতে হবে তা হোলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্ আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ....তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ....বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে....উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে....নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টিধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী....খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরি হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দ্যাখো তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছে—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট

ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বটঠাকুরদের বাড়ী? বট্‌ঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস!....তাহাদের বাড়ীতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি!—দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এ এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোন ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিসমিস্ দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিসমিস্ থাকে না? বাড়ীতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে! তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ!....সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ী অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা সে-বাড়ীর একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টুকটুকে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মত। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়,

এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকলে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না! উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, কথা বলচো না কেন?....কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বৈকি! তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক্ হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি?—সেইজন্যে রাগ হয়েচে? অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—তা হোলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নাই তো দেখচি—কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষণো আর তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ, আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে—অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলার তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা?

সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি ক'রে মার খায়!....তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাঁদর....তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে....

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রাণুদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না; এক এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়—খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে! দেখলে না ওহাতে রংয়ের গোলাম কাটলে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হয়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে—একি বৌমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে, এমন বিন্তি ছিল, দেখাওনি? তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে,—আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে ক'রেই দেখাই নি। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না—তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্লে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে, দাও, তোমায় আর খেলতে হবে না—ঢের হয়েচে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে—যেন কিছুই হয় নাই, সব ঠাট্টা উহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।....

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর বনের ধারের দিকের সেই জানালাটা....যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে....নাড়া দিলে ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিন্তি দেখানো!

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে খাবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গল্‌দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়....কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—

লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখে জল ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল! পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ঐরকম বলচে, আমি গেলে আমাকেও বলবে, ওর চেয়েও বেশী বলবে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ও-বেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না।

ভারি তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?....

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক্।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মত হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে! অমলাদি! কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুল ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘন্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং

করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই, অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে ?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা-দলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিনরিনে তীব্র মিষ্টসুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটাগুলো বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসি নি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস্? কি হয়েচে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায় নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুট্টি কান্ড ছাড়া তো এক দন্ড থাকো না বাপু!—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে— কি জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে। অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে, সব ঠিকঠাক্, আর কি না....

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্‌খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো ক্ষিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যস্! চক্ষের পলকে— সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন করে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাছিষ্টি কান্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসচি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকি পরে বেলা দুইটায় সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাসনয়নে ও-পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠানে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেলগে্ যা, আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচির পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ করচে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদরে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো। আমি আর দিদি পেড়ে আন্লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল! সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়ীতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ ক! তোমরা তো হলে কনে যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা, রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে। কাল সকালে নিয়ে আসবো—

দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থে রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিনরিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!....

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চার বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুর মত ওরকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলী গড়নের নয়—বেশ জোরালো হাত-পা ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণে ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্ সর্ দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস নে, দেখি?—

অপু তখনি দু'হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে—আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিসনে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস্?—আচ্ছা তুই বাড়ী যা....আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব ব'লে দিয়ে আসচি—রাণুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা আমি আসছি এখ্‌খনি—

রাণুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাক্‌রুণকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল....তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?....দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের

বেতের প্যাট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়—সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়াজঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চন্ডীমন্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলীবাড়ীর চন্ডীমন্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুজ্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনো ভাল করে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ও কি তোমাদের হবে? কল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পন্ডিত-বংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলো দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপান্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য-রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মন বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রং-এর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসাযাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘন বনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশে ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষী পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে রাঙাপাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেকদূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশ-পথে, এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা

দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্নগুলির সঙ্গে, আজন্মসাথী সুপরিচিত এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে। বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া কবচ-কুন্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুগ্ধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলো সব হল্‌দে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে ঃ-

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নঊরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলে মোরে!

কলুইচন্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরোনো মজা পুকুরের ধারে সে বনভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারিধারে বনে ঘেরা সেই পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নঊরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলাবেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে।

তাঁহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়, একেবারে বেলা শেষ হয়ে যায় তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করী আর্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বই দপ্তর কোনরকমে ঝুপ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা....নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর....গুলঞ্চলতার তার টাঙানো....খেজর ডালের ঝাঁপ....বনের দিক থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বাহির হয়....রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো বাতাবীলেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে....চক্‌চকে বাদামী রঙ-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উঠিয়া আসিয়া বসে....তাজা মাটির গন্ধ....ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ার জাল-বুননি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখ বাজে, পথে লুচিভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ....ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে?

—তা যা, ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল।

অপু হাসিয়া বলিল—চল্ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল—আহা-হা মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে, সারাদিন বলে হেঁট-মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘরে যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!....

শিয্যবাড়ী হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু, এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, রুইতন? দ্যাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিরে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলিল—তাস খেলতে খেল্‌তে সেই গল্পটা বলো না মা, সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই —শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলিল—খেলায় সময় ছড়া বল্‌লে খেলা কি ক'রে হবে অপু? ওঠ্—

সর্বজয়া বলিল—দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সে যে গোসাঁইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আর আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না? তা হলে লোকে তুলে নিয়ে যেতো—

অপু বলিল—সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি!

সর্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয়, খোকনের কপালে টি-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিট্ জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলো গিয়া নিজের হাতে ভাল তাস আসিলে, বিপক্ষদেলর খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল—যাঃ, তা হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, ব'লে দ্যাখ—

—করগে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ী পোস্তদানা

রদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতে পাল্লে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিল—কেমন হলো এখন? বড্ড যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলো হইতে কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা-ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

ছক্কার খেলা অপু বুঝে সুঝে খেলিস্?—দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।....

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিমগাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়া দাঁড়া বলচি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েচে মা! তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলি নে—উভয়ের উচ্ছ্বসি প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজঠাক্রুণকে, ডাকুকু না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুণকে সে—হাঁ। সর্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুর্গ্গা, ও কি ছেলের কান্ড? ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখের সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী....আর অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশী?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা! শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক-একদিন এই সময়ে অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠান্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ-শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নট্‌কান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-

পাপড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলোর ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামের জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের বড় কর্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে অফিস খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক; পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কষিয়া পুঁতিয়া জড় পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়ত শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরনের বা একটু বেশী গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কাঁটালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃপক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে—ফলে আদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে। মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ীর মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে—উপরের ঘরখানি হইতে সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নীচের যে ঘরে পালিতপাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চন্ডীমন্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতক-পত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নীচেই এক অল্পবয়সী কৃষক-বধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে এইবার তাহার পালা অসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সামনে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন.... আর গোলার চাবিটা খুলে দ্যান, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুনে। খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুণিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা ক'রে দাও—তার পর আর টাকা কৈ?

—ওই এখন ন্যান্, তারপরে দোবো—মুই গতর খাটিয়ে—শোধ ক'রে তোলবো, এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবিডা খুলে দ্যান, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তা পর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়—

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভাবী যে দেখছি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকী—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে দ্যান, ছোট লোকের কান্ডই আলাদা।—যা এখন দুপুরবেলা দিক্ করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চন্ডীমন্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্চায্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ও-পাড়ার তম্‌রেজের বৌ—দিন চারেক হোল তম্‌রেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে দ্যান্—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তম্‌রেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না—সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওকথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রূপার নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল! তাই ভোঁদা সেক্‌রার দোকানে বিক্রী কল্লে পাঁচটা টাকা দেলে— ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি, এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়া দেবো! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা গিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কান্ড কি নাকে কাঁদ্‌লেই মেটে? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাক্‌তো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্ নি—ওই পাঁচ টাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তম্‌রেজের বৌ আকুল সুরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে দ্যান, মোর টাকা কডা মোরে ফেরত দ্যান,—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরত দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হয়ে রৈল, আমার টাকা দেখ্‌বো না! ওঁর ছেলে কি খাবে ব'লে দাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পারিস্ তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্চায্যি বলিলেন—হ্যাঁগো বৌ, তম্‌রেজ কদিন হ'লো—কৈ তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে ভাঙন মাছ আন্‌লে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সহজ মানুষ ভাল খেলে দিব্যি— খেয়ে বল্‌লে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে দ্যাও, দেলাম—ওমা সঁইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আট্‌কাইয়া গেল। মিনতির সুরে বলিল—আপনারা এট্টু বলেন—ব'লে গোলার চাবিডা দিইয়ে দ্যান, সংসারে বড্ড কষ্ট হয়েচে— কর্জ কি মুই বাকী রাখবো— যে ক'রে হোক—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এস হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ-ঠাকুরদার দেশ বুঝলে হে, কি রকম দেখ্‌লে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ-বাইশের বেশী নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—দেখিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না বোঝেও না, দিনরাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল, তাহার দামী বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুম্‌টা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সারা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকরোগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল, —ভাবে মনে হয় প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই নিজেই অপরাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চট্ করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জ্বেলে নিই, ভাগ্যিস বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে।

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জ সুরে বলিল, দেশলাই আন্‌বো ঠাকুরপো?

নীরেন কৌতুকের সুরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নসুরে বলিল—ঝুল প'ড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম, কি জানি ও সব ইংরিজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নীচে পলাইল!

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল! নীরেন অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!....

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল—কি রাঁধচো ও খুড়ীমা? বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ ক'রে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে।....দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলেল—হ্যাঁ খুড়ীমা এ কাঁকড়া কোথায় পেলে? এ কাঁক্‌ড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর! বিধু জেলেনী ব'লে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, তুমি কিন্‌লে?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা! এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়ীমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়েছিল। খুড়ীমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না, পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সাম্‌নে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৌমা নাইলে না?....খুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নেই।....

খুড়ীমা ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল—দেখেচো বৌটাকে কি রকম মেরেচে গোক্‌লো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁটে আছে!....রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?....

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি।....গোকুলের বউ চুপি চুপি বলিল—আসিস এখন দুপুরের পর। ....দালানের দিকে ইশারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা আসিস্, দেখা হবে এখন।....তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল্—দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে, দূর কেন? কেন, আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি?....সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দ্যাখ তো এমন দুগ্‌গা-প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি। হোলই বা বাপের পয়সা নেই?

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, খুড়ীমা যেন কি....পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে দ্যাখো না....? দূর!....

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও সন্ন, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে দ্যাখ।

সখী ঠাক্‌রুণের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিও মা, ভবসমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো!

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাক্‌রুণ রোয়াক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা, দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউএর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাক্‌রুণকে সে যমের মত ভয় করে। মায়া-দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাক্‌রুণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—দ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখতে পাচ্ছো? একেবারে সম্পষ্ট জলের দাগ দেখ্‌লে তো? এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শূদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জজানো হয়েচে ! হাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল।

সখী ঠাক্‌রুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশি হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হাঘরে হাড়হাবাতে ঘরের মেয়ে আনলেই অমনি হয়, ভদ্দর লোকের রীত শিখ্‌বেই বা কোথা থেকে—জানবেই বা কোথা থেকে? বাসন মাজলি তো দেখলি নে এটোঁ গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাবলাম একটু জল মুখে দিই! শূদ্দুরের এঁটো, এখ্‌খানি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি!

গোকুলের বউ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মত্তে সন্ন পোড়ামুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হোত।

সখী ঠাকুরুণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হাঁড়ি কুড়ি ফেলে দাও গিয়ে। বাসন-কোসন মেজে আনো ফের। রান্নাঘরে গেবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারখারে দিলে।....সখী ঠাক্‌রুণ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম-মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্র, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারে বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাঝনদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া অবার ডুবিয়া গেল— সোঁ-ও-ও-ও-ভুস্।

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী; ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া অছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে......

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটির দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে অর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন থাকে—তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া চার দিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি— সিকিটা দু'য়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হইল। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে অর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু-হু করে। নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠোপথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখে দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।....

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়া ভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়েছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ী গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলার বাখারি চাঁচিতেছিল, অপু বলিল—এই কড়ি খেলবি? খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল, তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ী। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল—হৃদয় বাড়ী আছে? রামচরণ বলিল—হৃদয়কে কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও হৃদে বাড়ী নেই।

ঠিক-দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়ি খেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ী, অপুদের বাড়ী তাহা হইতে অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়েসে পটু কিন্তু ছোট; অপুর মনে

আছে, প্রথম যেদিন প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। ...অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি? ... পটু কড়ির গোঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সূতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গেঁটে; হেরে গেলে আরও আন্‌বো।... পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখচিস? গেঁজটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকী!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ্ বেশী!

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ্ বেশী থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশি কড়ি আমি কোনদিন জিতি নি; আজ আর খেল্‌চি নে—খেল্লে কি আর এই কড়ি বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশী! সব হেরে যাব!....হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশী নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।....পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?....সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষণ্ণমুখে বলিল—বা-রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত!—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন্ ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশী না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায় ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ, ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুঁষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলী ধরনের হাতে-পায়ে কোন জোর ছিল না, কিন্তু ঠিক সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষ-দল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশী; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলোর দু'একটি ছাড়া বাকিগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেশী লাগে নি তো?

এতদূরে ঠিক দুপুরবেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দু'জনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দু'জনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সেদিন অত করে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে!....

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা-কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খন্ড ক'রে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই।—আহা, ভারী তো একখানা বাঁকা-কঞ্চি! তোর যত পাগলামি—বাঁশ-বাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি? কঞ্চির ভারী অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি! আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আস্‌বো, আর তুই সব ভেঙেচুরে রাখবি—বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের?

বাঁকা কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন—কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হাল্‌কা হইবে ও পরিমাণমত বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জন-সমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নির্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি! ক্বচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ্‌ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়—পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহার ভারী লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। দিদি তাহাকে এ অবস্থায় দু'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে—একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা একা কাটাইয়া দিতে পারে!....

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিস্‌নে দিদি!....দুর্গা বলে নাই!

সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারী মমতা হয় ওর ওপর, ছোট্ট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?....

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল তোদের মাস্টার মশায়কে নেমন্তন্ন ক'রে আসিস—বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘন্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি,—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই; এত কম তৈলঘৃতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায় তাহা সে জানে না। পায়েস পান্‌সে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে দিয়াই পায়েস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুসি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল; এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়ীতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন!—আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাস্টার মশায়।....নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুগ্‌গাকে পছন্দ হয় ঠাকুর্‌পো? দিব্যি দেখতে-শুনতে! আহা! গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে?—সারা জীবন প'ড়ে প'ড়ে ভুগ্‌বে। তা তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও দিব্যি; ভাইবোনের দু'জনের কেমন বেশ পুতুল-পুতুল গড়ন!....

জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আমবাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকি, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হোল। ঐদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হায়রান। যে বন তোমাদের দেশে!

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকী! কিসের ফল ওগুলো?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিচ্ছু না, মেটে আলু।

—মেটে আলু? খেতে ভাল লাগে বুঝি? কি করে খায়?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশ্‌মা পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল—এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো।

—তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জসুরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেল্‌বার জন্যে।....একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশ্‌মা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারী কৌতূহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনেও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে ব'লো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বল্‌বে তো?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনার খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়েই, আমি তো—এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামলস্নিগ্ধতা

ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনো হয় নাই, রাত্রিশেষের অলস অন্ধকার এখনো জড়াইয়া আছে। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানলায় জানলায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘন্ট যে বড় খেলে না—পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

আসুন বৌদি। মোচার ঘন্ট খাবো কি? বাঙালে কান্ড সব; যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখতে পাই—কোন্‌টা ঘন্ট, কোন্‌টা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গব্‌রাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া, অভ্যস্তভাবে মুখের নীচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস্‌, ঠাকুরপো, বড্ড শহুরে চাল দিচ্ছ যে! ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশীটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না! যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন! দিন্ একদিন চক্ষুলজ্জার মায়া কাটিয়ে যত খুশী লঙ্কা।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট তুলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি নাকি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর—বলে কিনা যাঁহা বাহান্ন....হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামালাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না পশ্চিমে? পশ্চিমে গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন! সে বাংলাদেশে থেকে বোঝা যাবে না। বোশেখ মাসের দিকে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠান্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা, তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কতদূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়ীতে মাঝেরপাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌঁছানো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি?

—সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ী যায়—একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ীর মধ্যে আলো জ্বেলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরী করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙলেই হোল! এ কি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু'বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন্ জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

—মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আচ্ছা আপনি রেলগাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতূকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ, ভারী দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ও-বছর পিস্‌শাশুড়ী আর সতুর মা'র সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কম্ম—রেলগাড়ীতে চড়া!

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশের এমন একটা হাসি-কৌতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভাল লাগে। যে ধরনের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভান্ডার থাকে, যার কারণে-অকারণে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়; এমন কি যেন একটি গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এ বাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিমে! তুমিও যেমন ঠাকুরপো! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নীচু সুরে বলিল—দ্যাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখ্‌বে?

—কি কথা বলুন আগে?

—যদি রাখো তো বলি!

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইন পড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাক্‌ড়ী দু'টো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বলুন তো?

—সে এখন বলবো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নসুরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। দ্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে!

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন। পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাক্‌ড়ী দু'টো—টাকা পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা ছোঁড়াটির কি কেউ আছে ভূভারতে?....গোকুলের বউ-এর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয় দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন; কিন্তু মাক্‌ড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতূকের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে ম'রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা ঠাকুরপো, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝলে?

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক'রে দিবি? বড্ড ঠান্ডা হাওয়া আসচে।

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—রাণুর দিদির বিয়ে কবে জানিস? আর কিন্তু বেশী দেরি নাই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখিচিস্ তুই ইংরিজি বাজনা?

—হাঁ, সব মাথায় টুপি প'রে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি—মস্ত বড় ঢাক আমি দেখেচি—আর একরকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলোট্ বাঁশি বলে—এমন চমৎকার বাজে! ফুলোট্ বাঁশি শুনিচিস্?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ও-পাড়ার খুড়ীমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা সেকথার পর খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা, তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীমা?....পরে সে সেদিনের কথা বলিল— কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীমা ওতেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়ীমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা—বলছিলাম—গরীবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে— যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিগ্যেস করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধ'রে বল্‌চি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু তো যাহোক্ কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক-একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই গন্ডিতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠান্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রাণুদের বাড়ী গেল। ভূবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান সরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়!....অপু বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে, সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রাণুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হল্‌দে পাতাগুলো ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে— কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা-আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ।

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধূলার পর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার

কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো....সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো....সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভাল রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুর দিদির মত বাজি-বাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধূলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়ি পথের দুধারেই আমবাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বাউলের মিষ্টি গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, সিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সেঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সেঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষে ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সেঁয়াকুল সেদিনও তো সে খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মতো শুক্‌না সেঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিক পাখী ঝোপের মধ্যে কিচ্ কিচ্ করিতেছিল, দুর্গা নিকট যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রাণুর দিদির বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

একবার সে হাতদুটা ছাড়াইয়া ডানার মতো লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। উড়িতে চায়!....শরীর তো হাল্‌কা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া যাইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুক্‌না ঝরাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুক্‌না শুক্‌না ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সাম্‌নে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। টাট্‌কা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নক্সা পাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছই এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট্ট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষ ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতে হইবে হয়ত—যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রাঙী গাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালোবাসে, এই শুক্‌না পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের জন্য! ছইএর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধহয় এই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারের জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু'পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালবাসে!

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট আর্সিখানা বের ক'রে নিয়েচিস্ দিদি?

—হুঁ—আর্সি তো আমার—আমি তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নীচে পড়েছিল। যাও, আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আর্সি নিয়ে কি হবে?

—বা রে, তোমার আর্সি বই কি? ও-পাড়ার খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বের্তোতে আর্সি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও--

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আর্সি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল--দুষ্টু কোথাকার--আমি পুতুল গুছিয়ে রেখেচি আর উনি হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমায়—দেবো না আমি আর্সি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না আটকানো গলায় বলিতে লাগিল--কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায়—মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ি থেকে আল্‌তা চুরি কোরেচ—

আল্‌তা চুরির কথায় দুর্গা খেপিয়া গেল। ভাই এর কান ধরিয়া তাকে ঝাঁকুনি দিয়া উপরি উপরি কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আল্‌তা নিইচি?—আমি আল্‌তা নিইচি, লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ির গা থেকে কড়িগুলো খুলে ঢুকিয়ে রেখেচ, মাকে ব'লে দেবো না?

চীৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শূনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে, যে দূর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দ্যাখো না মা, আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দিচ্চে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না মা, দ্যাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—ধাড়ী মেয়ে—কেন তুই ওর গায়ে হাত দিবি যখন তখন?—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস?—আর্সি—আর্সি তোমার কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মার্তে। মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া একটান মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ী মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স! ও সব টেনে এক্ষুনি বাঁশবাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আল্‌তা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটফল, টিনমোড়া আর্সিখানা, পাখীর বাসা—সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি চড়াইয়া পড়িল। মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে, একথা কখনও সে ভাবিতে পারিত না! কত কষ্টে কত জায়গা হইতে যোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা বেশী কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেঝেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশবাগানের মশা বিন্ বিন্ করিতেছে, খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দূর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাগুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলো! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অপু বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভায়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—কাঁদিসনে, চুপ চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ, কাঁদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানা গল্প, বিশেষত রাণুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথার পর অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি?—তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল; কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীমা বল্‌ছিল রাণুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ বল্‌ছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠ্‌ল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে?

—আমি এসে মাকে জিগ্যেস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগ্যেস করবো দিদি? মা বোধ হয় শোনে নি; কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাষ্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলো চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা! সে ভাই-এর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার যোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল—ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে—ঠাকুরের বড্ড দয়া—মা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল—লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ী কেনা হয়েচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রাণাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বল্লে—বালুচরের শাড়ী—

দুর্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস?···· পিসি বল্‌তো,

বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই।

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাভাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইএর বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ওবই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইএর মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়।

যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারেনা। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য! এ সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠো পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়্‌কি-দোরের বাঁশ বাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সাম্‌নে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়তেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেচে! কোত্থেকে এলো দেখ্‌লি?—খুশিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ্! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আস্‌বে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে—ঠিক শুন্‌তে পায় তো, আসে কোত্থেকে! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুন্‌তে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটালতালায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখ্‌তে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজী হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি-আর বেগুন বীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না; ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ীর দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ্ পাখী ময়না পাখীর মত ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাত্ড়াইতে হাত্ড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে। এঃ, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না···কান্না···হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনি নি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা, বদ্মায়েশের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে,—এই নেও শকুনির ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বল্‌বো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

পথের পাঁচালী — বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলী পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু, আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে, অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়ত লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু তা হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দুখানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলিলেন, আমি মর্‌বার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ওসব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথে বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্ট-খানেকের বেশী কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকের দিনের সকল খেলাধূলা সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি কর্‌বি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়, তাহার মাও যায়। কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিসপত্র। অত চাল-ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভাল চাল, ডাল, ঘি, দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটি বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যেদের সেজ ঠাক্‌রুণের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসে!····

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাঁশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ তেঁতুলতলায় মা আস্‌চে কিনা—আমি চাল বের ক'রে নিয়ে আসি শীগ্‌গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তম্‌রেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী না, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠীর মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্রোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচে মধুখালির বিলির ধারে থেকে তুলেলাম—কোঁচড় হইতে একগাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড় বড়! কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দেবানি—

দুর্গা রাজী হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চা'লভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো! উহারা খিড়্কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটি হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো···

অপু মহা উৎসাহে শুক্না লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যেন, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি!—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মত হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়,—সে কতদূরে? কোথায়? কেহ আর তাহার খোঁজখবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে আর করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে?

তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া—আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাহাদের বাড়ী, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে না। দিন-রাতে খেলা-ধূলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এ কথা তাহার প্রায়ই মনে হয়···ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে··· আসিতেছে···শীঘ্রই আসিতেছে···

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্‌নো কাঠ দ্যাখ্ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে একবোঝা শুক্‌নো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো?…দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রং হচ্চে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধপোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল! এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবন পথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখেসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ! আজকের আনন্দ! সামান্য, সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ!

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো, অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল—নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন কর্‌বো—কেমন তো, ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে।

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাঁহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা চুরুট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো তেতো কেমন একটা ঝাঁঝ—দুটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘ্ড়ীর স্ত্রী হরিমতি বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানারকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস্ করিনে, বৌটে তেমন নয়। আবার নাকি শুন্‌লাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব।—যাক্ বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুন্‌লাম বল্‌চে—আপনারা সকলে মিলে একজনের ওপর অত্যাচার কর্তে পারেন তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বৌ-ঠাক্‌রুণ একবার হুকুম করুন আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মত মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ডেকে আন্‌লে, জিনিসপত্তর নিয়ে চ'লে গেল।

সর্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ

করিয়াছিল—'ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে নীরেনের পিতা বড়লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়াকে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি, ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়ীমা লক্ষ্মীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা কি বল্লে-টল্লে দুর্গা?.... তা নীরেনের কথা কিছু হোল নাকি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি কাল জিগ্যেস্ কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল,—খুড়ীমার কাছে কি শুন্‌লি, মাষ্টার মশায় আর আসবেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাইএর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া যদি সে বাড়ী না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার অমন দুধে-আল্‌তা রংএর সোনার পুতুলের মত ভাইটা ময়লা আধছেঁড়া মত একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দরজার সাম্‌নে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারী কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী রাণুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘন্টা খানেক পরে, সেজ ঠাকরুণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ ঠাকরুণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি, কি? টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিসের তলা হাত্‌ড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোষক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখান্‌টায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুলতে মনে নাই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাকরুণ বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে করে নিয়ে যাস্‌নি তো?

—না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাক্‌রুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাক্‌রুণের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে, এই মাত্তর আবার এসেচে—

সেজ ঠাক্‌রুণ চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস বল্—বার কর্ এখ্‌খুনি বল্‌চি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাক্‌রুণের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয় নি বোধ হয় সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বল্—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভাল কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বোল্‌বো না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি?

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—তুমি ভাল কথার কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবার, তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—এ কি যা তা পেয়েচ বুঝি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, বল্ এখনও কোথায় রেখেচিস্?....বল্‌বি নে?.... না, তুমি জানো না, তুমি খুকী—তুমি কিছু জানো না— শীগ্‌গিরি বল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেলবো এখুনি! বল্ শীগ্‌গির —বল্ এখনো বল্‌চি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্‌চো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল, —কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুক্‌নো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাক্‌রুণের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাক্‌রুণের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্ কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল্ শীগ্‌গির—বল্—

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাক্‌রুণের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাক্‌গে আমার কৌটো—ওরকম ক'রে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ, রক্ত পড়ছে যে....

দুর্গার নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন,—শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি— রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে দ্যাখ্—

চেঁচামিচে ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল।

জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন ক'রে কি মারে সেজদি?....রোগা মেয়েটা—ছিঃ—

— তোমরা ওকে চেনো নি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এই ব'লে দিলুম—মারের এখনো হয়েছে কি—না পাওয়া গেলে ছাড়্‌বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

রাণুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সাম্‌লাতে দেও সেজ্‌দি—যে কান্ড করেচো—

টুনির মা বলিল—ওমা, এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলতো?....চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্‌দি—

সেজ ঠাক্‌রুণ এত সহজে ছাড়িতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল।....কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কীর উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষেণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে আস্তে যা—টেঁপি খিড়কীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না—কি রকম দেখচো একবার? ....চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়লো না—

রাণুর মা বলিলেন—জল পড়বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওইরকম ক'রে মারে সেজদি!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ সেক্‌রার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল—পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আন্‌লাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশী দেরি নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য

গৃহস্থ বাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চা'ল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চা'ল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ দল কোনো বারই আসে না! দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মন্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুন্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বল্‌তে বল্‌তে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুন্‌বি বোল্‌বো?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা? ....দাশু কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম— দেখিস্‌নি রাণু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুন্ড রাণুদি?

—নয় তো কি? অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখতে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ী যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি? কি আজ হবে রাতে?....

রাণী বলিল— সে সব কথা বল্‌তে নাই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুন্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুরমা?

বুড়ী বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা?....তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নাই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কি করে বাড়ী যাবো ঠাক্‌মা!....

বুড়ী বকিয়া উঠিল। —তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?....এসো আমার সঙ্গে। নীল পূজার থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকান্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।....রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্‌ এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মায়ের বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।....

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ী এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়ীগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে, যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারীতলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুন্‌তে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, সে কান্নাভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তর্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারীতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়ীতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশী রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে খোকা চট ক'রে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ্‌ রে!....অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া

দেখায়। বলে—বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাবো।....তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন, খোকা—আচ্ছা চট্ ক'রে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচন্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়াভরা বৈকালে বাঁশ বন ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!....কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায় নিরীহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখেনে বসবে? মা বলে—এখন থাক; আমি ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারীতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু পয়সায় মুড়কী কিনে খাস্, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস্। ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে— বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা, সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরস-মুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারী মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা একটা কাজ কর তো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব!—

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন্ আলাপ করে, ভাল বেহালাদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কখনও সে ভাল জিনিস শোনে নাই—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে.... মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির আলো-সজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ

করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো....? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!....

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?....তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেচে? ...চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগী-রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী! ....ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়! কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নেই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!.... যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে —ঝাড় সামলে!....কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালায় কসরৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুমে পাচ্ছে....বাড়ী যাবো খোকা? ....ঘুম! সর্বনাশ!....না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ী গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দ্যাখে, অবাক কান্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!....রাজকুমাক অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইএ হাত দিয়া বলিল—এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা? রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে?....অজয় একটু অবাক্ হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই?....আমাকে একজনের বাড়ী খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে?....

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে যাবে—

খানিকক্ষণ দু'জনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার এক্‌টো হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনলি?....অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ী খেতে আস্‌বে—

তাহার মা বলে—দুজনে খাবে?—দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে—তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বল্লে—কেমন যাত্রা রে অপু?....এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যা ম'রে গেল?....অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজ্‌না তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রং, অমনি বড় বড় চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গীতে প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে"—

অজয় গলা ছাড়িয়া গান গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল—সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজ্‌বো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ীর মত, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই, তোমার তো গলা মিষ্টি—একটা গান গাও না?....অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে

বসে। অপু অনেক কষ্ট লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালীর গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক্ হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি গান গাও না কেন?....আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুক্‌লে পোনেরো টাকা ক'রে সেধে দেবে বল্‌চি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সাম্‌নে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?....দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হৌক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না?....তাহার পর দুইজন গলা মিলাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজচে ভাই? অপু বলিল—ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল— আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?....যেও না কোথাও, থাকবে?

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়?

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছ। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দেবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার" হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ী ডাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন-চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাইতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এস না খোকা, দলে আস্‌বে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল—আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী-ঠখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভাল ক'রে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টিপাথরের রং একটা ছোক্‌রাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখেচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্‌ ছম্‌ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে। নাচে ভালো ব'লে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনের মধ্যে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বল্‌লে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে। অপুর আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!....

পথের পাঁচালী — চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরি দিবে (কাহারা চাকুরি দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মত অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোন জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আসা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা না একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কৈ?....

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্য্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই-তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয়, দুদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই-তিনখানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজ্যেশ্বরবাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লে নাকি? ওসকল বড়লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আর আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না আর একখানা, লিখেই দ্যাখো না—নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে শুরু করে।

এবার হরিহর যখন যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু'তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালী, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ার উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে দোয়া এক পাত্র সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকা মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আল্‌তাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুরবাড়ীর ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যেবেলাও তো জ্বর এসেচে? দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?....তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভাল যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো—

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আস্‌বে না আমার—ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এম্‌নি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু-হু করে, ভাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজ ঠাক্‌রুণদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সেখনে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা!....সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!—

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো! এক-একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ! সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না।....কি সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকী?....দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নাই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল,—নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতুহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল, এসো এসো, দোষ কি ?....এসো, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়া তাকাও দিকি খুকী?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘরবাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না! কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেচে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লে? এবার বাড়ী এলে সব কথা ব'লে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চক্ চক্ করে—অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্ চক্ করছে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই। কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?....আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগানো রয়েচে যে দোকানে! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্পপরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলতঃ কোন অংশই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?....সে বিস্মৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে?...

দপ্তরে একখানা বই আছে—বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়! হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চাম্‌ড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।...'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়া, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা লাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নামতা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভুয়ো গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মণ ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত নানা আজগুবী কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবী গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌঁছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই! তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম ইয়ে হয়—তা সব দেওয়া অছে কি না? মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না, ওঠা যাক্, এর পর যাওয়া যাবে না—দেখচো না—দেখচো না কান্ডখানা? একটা বড় ঝট্‌কা-টট্‌কা না হোলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস ব'লে দেখতে পাস্‌নে, ডাক বাক্সটার কাছে ব'সে থাক্‌বি—পিওন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিগ্যেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস্ করে এস দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈ কি?

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরে চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট্ করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কিরকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্‌বে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড় করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আন্‌লে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত—! উঁ-উঃ! তোমার তো ব'সে ব'সে সুবিধে!....ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল! যাও দিকি?...

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না—

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পূবে হাওয়া, খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিনরাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়ে অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল-আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক্-ওদিক্ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!...নদী-নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালীর শব্দ নাই কোনোদিকে ! চার পাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ! —অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল কতখানি জল এসেচে রে?...অপু বলে, তোর জ্বর সার্‌লে কাল দেখে আসিস্!...তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?...

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, তা হবে না মা, আমার খিদে্ পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো—হুঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার—ও রকম কি করে! চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন ক'রে, দেখচিস্ নে কি রকম সেঁওটা করেচে?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ্ একটা কইমাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কিনা?...তাই সব উঠে আস্চে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?...

অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আস্বো এখন। পরে সে অবাক্ হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কী ক'রে এল? বাঃ তো!—মা কি ভাল ক'রে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে—আজ যদি এখ্খুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা হ'তে কি আর পারে না? নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েচেন—কি জানি কি হোল অদেষ্টে! নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হোলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—শামলঙ্কা বাট্না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয় পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনক্যি!... আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ কোরে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুয্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছে।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চূণের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস্ তো—অত বড—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভঙিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা—ও দুর্গা শুন্ছিস?...একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুর্গা—শীগ্গির, একেবারে ভিজে গেল যে সব?...

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা...তাহার মন ছম্‌ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে...কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল? কোন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক্‌গে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না?...তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা—

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?...

নিবারণের মা বলিল—আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে ক'রে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠাক্‌রুণ, না পুরোনো?...

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি?...একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি—ধোয়াতোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস্ নে?...

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা ঠাক্‌রোণ...খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি?...একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনাবার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজী হয়—বড় মুস্কিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আস্‌বো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোণ?...বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট!

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশী করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থৈ-থৈ, হু-হু পূবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু-হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড় গোঁজা ভাঙা কপাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশী বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্ হুস্ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে!··· জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দম্‌কায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে...ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়...গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!...মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি?—এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?...মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অম্‌নি পান্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার ক'রে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের

রোয়াকে মুখ বাড়াইল...বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু-হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার! ঝড়-বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রূর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—সু-ইশ সু-উ-উ-উইশ্...সু উ উ উ ই শ...এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বল-সঞ্চয় করিতেছে-সু উ উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই ই-শ্...! কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য!...বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে সে মহাশক্তিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য...এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না...

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল...আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোন জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো! জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে...হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে...সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্ তো? জল পড়চে—। অপু ঘুমচোখে জড়িত গলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে—অপু? শুন্‌চিস ও অপু? ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়চে—একটু স'রে, পাশ ফের্ দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়— পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল —বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!...তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা—? কে আছে কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখন ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়্‌কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ!...সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি?...একবার শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কি হয়েচে দুগ্‌গার?...

সর্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগ্‌গির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্ছি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা?...দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া

আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝড়ের বাঁশ নুইয়া পথে আটকাইয়া রহিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেচেন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে বিলিতি চট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!...নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু?

অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা?...জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আস্‌বে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েচে...তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এইরকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নেই, জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় জলপট্টি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেচে আজ দেখেচিস্ দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেকদিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল। খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগ্গীর—অপুদের বাড়ীর দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্গা চা দিকি—ওমা, ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সব সরো দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘন্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়েছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়া ছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্যে করে এমন নাই—খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্থ ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দির-দর্শন-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলে মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারাই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের

বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভায় সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারী-বাবু নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত মুখ ধুইল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়ে যেন নামে না—মাত্র দিনদশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই—এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাক্সের কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্য পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ—হরিহর বলে—বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্চে যে! অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই শর্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু, বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীর সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা! সন্ধ্যার পর পূর্ব-পরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভালো ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ইঁটের লোহার ফটকওয়ালা বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম্, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন—অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট্ করি—তা ভাগবত কি গীতা পাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরীয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, ক'দিন ধ'রে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন, যান্, অন্য কিছু হবে-টবে না, নিন। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত

না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এম্‌নি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরে কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ীর কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার সময় বাড়ীর কর্তা দশ টাকা প্রাণামী ও যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতে পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায় পথিকের চরণভঙ্গীতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ীর কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চূর্ণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আল্‌তা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুক্‌টাক দু'একটা জিনিস সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল—একটা কাঠের চাকী-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গা — ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের সচিত্র 'চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকী—বেলুন এনিচি এবার। পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্চাসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদী বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমোর আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ যোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে!

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মত রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশ আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহঅভ্যর্থনা—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখী শ্যামার, শিশিরস্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানা অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলানেবু রংএর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ শাড়ী পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রাণু দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ-ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ী পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন সাজাগোজ, তেমন দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হোল না?—বাঃ—তোমাদের যা কাজ-কর্ম, দেখো এখন এর পর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বস্‌বে কি বেলা পাঁচটায়?

পথের পাঁচালী **সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ**

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতে সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুয্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনাইয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া ছিল কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয় ; কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরি করিতেন, সেখানে লালিত পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক এ কথা জানিয়া জায়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া কোনরকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলেমেয়ে সর্বদা ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া আছে, কাপড়

এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে—মোটের উপর সর্ব বিষয়েই সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চাল-চলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনের-ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলীবাড়ীর রামনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলীবাড়ী রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সেও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিত সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন কথাবার্তার ধরণ এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁসে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল—বল তো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল্ ফ্র্যাকশান কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে

পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো বঙ্গবাসী তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের গোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনো স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যে সব শিষ্য-বাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বউ, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠোয় পায়।

একদিন এ কথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পূজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তা হলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জেঠতুতো ভাই পাটনার বড় উকিল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতী করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকীল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধ সর্বজয়ার মত হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিশালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জেঠীমার কাছে গিয়া বলিস্ না যে, জেঠীমা আমার জুতো নেই—আমায় একজোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস্ না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভলো একজোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিস্নি যেমন ঐ সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওইরকমই লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে, আমি বলতে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি...

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি!...আপনার জন—বলিস না —তাতে কি?

—হুঁ...উ—আমি বলতে পারবো না মা। আমি কথা বল্‌তে পারিনে জেঠীমার সামনে...

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্ধি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে নেই জুতো সে ভালো, বড়লোক, চাইলে হয়ত দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে?

—কেন আসবো না রাণুদি,—আসি তো?

রাণী অভিমানের সুরে বলিল—হ্যাঁ আসিস্! ছাই আসিস্! আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস্ আমার, আমাদের কথা?

—না বৈ কি! বা রে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল,—থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মত সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোন মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মত মন কোনো মেয়েরই নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে তো সে রাণুদি। রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে তাহা কি আর অপু জানে না?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না। একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাব।

রাণী বলিল—কোন্ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস্। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভাল লাগে না, তুই যদি যাস্ আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ সেই বনের মধ্যে ব'সে মাছ চৌকি দেবে বৈ কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমার বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে সে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারী হইতে বাছিয়া এক-এক খানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড়

হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে—প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃত গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা....সে কত নাম করিবে! এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ্ টিপ্ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন্ দিক দিয়া বেলা গেল!

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌকা লুটিয়া তাহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদন্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরী, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন....ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন--রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস্ নাই, এ দেহে প্রাণ থাকিতে....ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মত বলিষ্ঠ চারি-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমন্ডলুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।....গ্রন্থকারের লিপি-কৌশল সুন্দর,—সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদন্ড হইবার পর কি উপায়ে তাঁহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল....ইত্যাদি।

এক-একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে—গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দুই-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখীর ডাক শুরু হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইয়ের পাতার এক-ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এইরকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই! কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে।

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'।....উইঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ার দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রূষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মন্‌সবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচ-হাজারী? একবার পুনায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার আছে গণিয়া আসিবে!....

রাজাবারার মরুপর্বতে, দিল্লী-আগ্রার রঙমহালে, শিস্‌মহালে, ওড়্‌না-পোশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া ঊষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত্র পার হইয়া ছোটা?....

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য—প্রতাপসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হলদিঘাটের পার্বত্য বর্ত্মের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুন্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হল্‌দিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।....

অদৃশ্যহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল।—অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতানার ভীল-প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান, নাহারা মগ্‌রোর অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য সে ভাল করিয়াই চেনে। পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়!....

"সেই চপ্পন প্রদেশে অনেকদিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল-নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্ন বনদেবী হইবে"....সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!....

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীলপ্রদেশ, বীরবালক চন্দনসিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বুনাস ও বরী নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলরাশির উপরে, বাজ্‌রা ও জওয়ার-ক্ষেত ও মৌউল বনে।....

চিতোর রক্ষা হইল না! রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?....

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উঁইটিবি, বৈঁচিবন, বাঁশবাগান—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনো মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে সে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্ধকী মাক্‌ড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশী হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেছে—না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।....

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখচিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কি ক'রে—

—আমি তোদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়ীমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বোল্লাম। কেন, খুড়ীমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বইএর দপ্তরে তোর রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো? অতসী বল্‌ছিল তুই ভাল লিখতে পারিস্ নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।....

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।....তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে ব'সে পড়।—অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হোলে যত লেখা-পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস্ কি? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হোলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠবে। আস্‌চে বছর পৈতেটা দিয়ে নিই, তারপর গাঙ্গুলীবাড়ীর পূজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

....চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস্?

অপু হাসি-হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে?

রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ, অনেক লিখেচিস্ যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস্ ক'রো দিকি অতসীদি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রাণী বলিল—না ভাই, ও লিখেচে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালো।....পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরণে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে রাণুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরৎ দিয়াছে।....

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে; সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই,—সকলেই পার্শ্ববর্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে।....ছোট ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায্ ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে, খেও এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ শোরগোল হইতে লাগিল—"লুচির ধামাটা এ সারিতে" "কুমড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই", "ওহে, গরম গরম দেখে", "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্রেফ কাঁচা ময়দা"...ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের তুমুল বিবাদ! কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে ভদ্দরলোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই। স-পাঁচ গন্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট— বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দপ্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্তা হাতে-পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেচিস—দেখি খোল্ তো? লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেও এখন।

অপু বলিল—তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমার জন্যে আমি চেয়ে দু'বার ক'রে পানতুয়া নিইচি।

সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বল্লি নাকি আমার মা খাবে দাও?—তুই তো একটা হাবলা ছেলে!

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি! এমন ক'রে বল্লাম তারা ভাবলে আমি খাবো।

সর্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন ব'য়ে আনলি বাড়ীতে? কে আনতে বলেচে তোকে? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা, সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে! ও এরপর ঠাকুরপূজো ক'রে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ঐজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে! যা, ওসব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা; না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোটলোকের মত ওসব বেঁধে আনবার দরকার কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল—যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশী হইল, জেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলারে বামুনের ছেলে? বা রে, জেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা তো ও-সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সে-ই বা নিজে এসব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে।

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু— জেলে পাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সে-বার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এপাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনো ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারী ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম-শিমূল গাছ, বেগুনী রংএর বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে বনের ছায়ায় উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়—মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দন্ডের পর দন্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছট্‌ফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসার খোঁজে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুকরাইতেছে! ছিপ তুলিয়া বলে—দূর! ঝোঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না। ....পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রঙএ মনে হয় বড় রুই কাৎলা এখনি টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, শরের ফাৎনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।....

এক-একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরেজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে দু'টি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রতীরের শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সে সাহসিনী বালিকা প্রাস্‌কোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদন্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল—তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্যার ফিলিপ সিডনীর ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশদা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় ক'রে বলো না?

সুরেশ বলে—ও, জুট্‌ফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কি সুরেশদা? জুট্‌ফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না।....

মাসখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার এই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূপ্রসারী সবুজ উলুবনে কাশঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ!

বঙ্গবাসীতে বিলাত যাত্রীর চিঠির মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে....

সে সুরেশদাদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন,

রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী কে ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকদুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্ততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দু'টি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড় কর, অস্ত্র ধর, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে। দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী,—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু সে ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প. রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্ধমান বালকমনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরের নীল-সমুদ্র-ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র!—শুধু নীল আর নীল! আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকান্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে, —যেন কোন্ দেবশিশু অলকার জ্বলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া একটা বুদ্বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সাম্‌নে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস্, তাই এলাম। মাছ হয়নি?....একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সাহেবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে,—গোলপাতা-বোঝাই, ধান-বোঝাই, ঝিনুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে ; মাঝ নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল,—একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখিছিস্ পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুনে দেখি এক-দুই ক'রে! পারিস তুই অতক্ষণ ডুবে থাক্‌তে?....

নদীর দূর্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোঁটা পোঁতা—নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়, —অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ঐ ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা

একপাটি কি দর?....তোমার এই ধানের নৌকা কোথাকার, ও মাঝি? ....ঝালকাঠির? সে কোন্ দিকে, এখেন থেকে কতদূর?....

পটু বলিল—অপু-দা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর-এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইএ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা-আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দুরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখচিস্! এখুনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে—গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল, তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠান্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল। পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল! অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাঁধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল!

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা , সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে ক'রে আনিনি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকায় গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে ঝটিকাক্রুদ্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব মুছিয়া যায়! নিজেকে সে বঙ্গবাসী কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মতই কালো, গভীর ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ; এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকটির মত সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চাল্‌তেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনে সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!...

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশ-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুব-ডুবু হইলে "আমার অপূর্ব ভ্রমণ"-এ পঠিত নাবিকদের মত সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লি-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রংএর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযূ, গ্রেস্ ডার্লিং, জুট্‌ফেন, গাঙ্গচিল্-পাখীর-ডিম-আহরণরতা সেই সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকর যাদুকর বটগার, নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—আরও কত কি আছে! তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রাণু-দিদিদের বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলো ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে; সেসব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহার ডাক আসিবে একদিন —সে-ও যাইবে!

এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুরপূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড়, ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ—তাহার আশা ভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে....এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র! সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক্ দিক্ হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙীন্ ভবিষ্যৎজীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

পথের পাঁচালী — অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়েসে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই—দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ

ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।...

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ-পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে ও ঐ গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাহার সহিত কখনো দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস্ নে তুই, একলা যাবি বৈ কি? এখান থেকে প্রায় চার-ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এইরকম বাড়ীতে বসে থাকবো? যেতে পারবো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই?

—সব আছে, উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরি আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলেমাটির তাত লাগিতেছিল—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারের বন-ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাঁইবাব্লা গাছের নতুন ফোটা ফুলের শীর্ষ সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বনডুমুরের মত কি ফল অজস্র পাকিয়া টুক্‌টুক্ করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদ্‌পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে।... সে মাঝে মাঝে নীচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটার দু'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুলফলের থোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে— খোকা, তুমি শুধু পথে-পথে বেড়িয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।....মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনের কঞ্চির ডালে ডালে শর্-শ্‌র শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙএর পাখীর গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে— গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখীর কাকলীতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায় তাহা সে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গরমের অবসানে সারা দিকচক্রবাল্ জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনাডাঙার মাথার উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলে-ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রি-কাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।—অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার ব্রত নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।....

নতিডাঙ্গার বাঁওড়ে কাহারা মাছ ধরিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামের মধ্যে একটা কানা ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে ঃ—

'দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।....'

বোষ্টম দাদু গানটা খুব ভাল গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরের পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়, তাহাদের গাঁয়ের প্রসন্ন গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?....এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আস্‌চে মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে; হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে। ....সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে এ কথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু—একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো-উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি-হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আস্‌চো? ....অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অ-অপু।

তাহার মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত! হয়তো তাহার পিসীমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল!.... তাহা ছাড়া, —কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া হাতমুখ ধোয়াইয়া শুক্‌নো গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির শরবৎ করিয়া আনিল। পিসী বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স, রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসীও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসী বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু গর্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ী, খুড়তুতো ভায়ের ছেলে; সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা-যাওয়া নেই তাই! ....পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই—দ্যাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, এখন বোঝ কি দরের—কি বংশের মেয়ে আমি!....

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ চক্রবর্তী বাড়ী আসিল। পাক্‌শিটে-মারা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসীকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখচি তো তুমি?....

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দূর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসীর বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে চিঁড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারী পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল। রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভাল? .... এখন সে কি করে? নাঃ, বাড়ী ফিরিবে না। আরও খানিক পথে পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ী যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়িতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয়-সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধেচো জেঠিমা, মোরে একটু দেবে?....অপুর পিসীমা ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী? না, ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস্...গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলা ঝাঁকড়া ঝাঁক্‌ড়া, ছেলেদের চুলের মত খাটো। ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসীমা?

তাহার পিসী বলিল—কে, গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুয্যের বৌ—এই যে পাশের বাড়ি, ওর দূর-সম্পর্কের জেঠী—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল—সে অনাথা মেয়ে গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসীমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে; নিবারণ মুখুয্যের বৌ ভাল ব্যবহার করে না, লোক ভাল নয়। পিসীমা বলিতেছিল— জেঠী তো নয় রনচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগন্ডা—তাদেরই জোটে না, তায় আবার পর!....গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় না—ছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আঁচলে কি লুকচ্চিস্ দেখি খুকী?....গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া দৌড় দিল। তাহার কান্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকী, কিছু বোলবো না, ও খুকী! ....গুল্‌কী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়কী দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া,

তোকে ধরচি এক দৌড়ে— বলিয়া সে খিড়কী-দরজার দিকে ছুটিল। গুল্‌কী আর পেছনদিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুট্ দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলো মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, খুকী? ....গুল্‌কীর প্রথম ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়; কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উঁকিঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া—দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নেই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি! এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল—এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৈঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে!

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়!—সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকী? চল্ ঐ পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি; ঐ কাঁঠাল গাছটা বুড়ী। আয়—

মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দূর যাবি—ঠিক তোকে ধরব দেখিস। আচ্ছা, ঐ গেলি তো এই দ্যাখ—বলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারী ছুটতে শিখিচিস্ খুকী না? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস্? চল চোর-চৌকিদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁঠাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝলি?....আর আমি হবো চৌকিদার, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে? অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসীমা ডাকিলে পিছনে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসী জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে বোস্—মোচার ঘন্ট আছে—ডাল দিচ্চি, অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দুখানা মাছ এর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশীকত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসীমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁসফাঁস কচ্চিস—নে ওঠ্, কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি দ্যাখ্ তো? তোর কেবল দিষ্টি-খিদে—পরে বলিল, জেঠীমার কান্ড দ্যাখো—এতখানি বেলা হয়েচে—কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না? হলোই বা পর—তা হলেও কচি তো?....

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল—চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পূজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগবে—। অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই? মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার

হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের দিও। অপু ভাবিল— বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাকতো আরও দু'পয়সা দিতাম—

পিসীমার বাড়ী ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসীমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীদের বাড়ীতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল—ওরে জেঠী, অমন ক'রে মেরো না—ওরে বাবারে—ও জেঠী মোর পিঠ কেটে অক্ত পড়চে—মেরো না জেঠী—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলার চিৎকার শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েস—চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পায় না, বলে কি না খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না?....তোমায় আজ—

অপুর পিসীমা বলিল—দেখচো, ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌চে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হলেই তুমি খারাপ—।

অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুন কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালাপাড়ার দিকে চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূরে গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে কিছু না—। পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যি রে, সত্যি বলচি, এই দ্যাখ্ পুঁটলি, কার্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়া গাড়ী উঠবো—আয় না আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। বামুনপাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই রাঙা জামাটা ক' পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি? গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ তুমি যদি দাও, এখ্‌খনি....

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই অপু দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছপালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! পরে গুল্‌কীকে বলিল—আর আসিস্ নে খুকী, তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস—তোর বাড়ীতে হয়তো আবার বকবে—চলে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ্ মাসে, সেখানে বাস করবো—গুল্‌কী আর একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথে দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না)। পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ করিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বীরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রী সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছা আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞাসা করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক্ হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল—কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলি নি, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে! সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড় হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনীর ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না,

মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক-হাঁড়ি শুক্‌নো আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আম্‌সি আমচুর তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট্ কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্‌সে পুতু পুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না যা—কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ— ছেলের যা কান্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? ....দিদির শিল্পানুভূতি শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ায় গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখীর ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কল্‌মীর ফুলের দুলুনিতে— দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশী হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! ....আর কখনো, কখনো—সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।....

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশী বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভালো লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল—মালপাড়ার হারাণ মাল এক বান্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক' পয়সা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ— হ্যাঁগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশি একটা কিনিল। বলিল—কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙুল টেপো হারাণকাকা? একবার দেখিয়া দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙীন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙীন কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোন না কোন জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনী ফুলুরীর দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু'পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বলবো, আমি মেলা দেখবো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ী-ঘর, ওই বাঁশবন, সল্‌তে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পরিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যে তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কি লইয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে কি একটা জিনিস গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ধূলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজঠাক্‌রুণদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি ক'রে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়্কী-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলাইয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বনঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুক্‌না বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচি-ঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে কেউ জান্‌তে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছেপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুন্‌তে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী করে নিবি, আমায় পঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা! মেলার চিহ্ন স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইতেছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!...

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই দ্যাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাহার অবোধপুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সকলের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয়তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো! সর্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আট্কাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনোঝোপ শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রংএর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন্ প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়ীতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূর চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগাতলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল। আজ আষাঢ়ুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, সেক্রার দোকানের ঠুক্ঠাক্ শুনা যাইতেছে, খেজুরগুড়ের আড়তের সাম্‌নে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারি ক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে

রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট-অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত, চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে-সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাসিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য শুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখনও গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট্ সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্ খট্ শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশী দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!...

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ী পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বৌটি হবিব্‌পুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চালডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড় ট্রেনখানা। কি ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড!

হবিব্‌পুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেঝেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গারোয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলো সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, ছোটখাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটা একটানা শব্দ হইতেছে—সাম্‌নের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!....

অনেক দিন আগের সেই দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া উধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দু'জনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়! কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে ...আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা... চাল্‌তেতলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু... দিদির মুখ...দিদির কত না-মেটা সাধ....

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক্ হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

অক্রূর সংবাদ

দুপুরের পর রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলোকে কি বলে? সিগন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ী যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমত ইঁটের গাঁথা, ঠিক যেন রোয়াকের মত। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে—কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘন্টা পড়ে —ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা—অপু শুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগ্‌ন্যাল পড়ে—কুড়ুলগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

সর্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার কথা? সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা-নামা লক্ষ্য করিতেছিল—বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র। জগন্নাথপুর স্টেশনে ভাল মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালবাসিস্, নেবো তোর জন্যে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখী বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো মা, কাদের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটা ময়নাপাখী পালিয়ে এসেচে!

নৈহাটি স্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া গঙ্গার প্রকান্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য অস্ত যাইতেছিল, সর্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল—ওপার হইতে হুহু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল ভাল বাড়ী বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্চি, অপরাধ নিও না মা, কাশীতে গিয়ে ফুল-বিল্বিপত্রে তোমায় পূজা করবো, অপুকে ভালো রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে পুলকে, অনিশ্চিততার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল—এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। সুবিধায় হৌক, অসুবিধায় হৌক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদ-নদী, দেশবিদেশ—ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া সে যখন ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যান্ডেল স্টেশনে গাড়ী আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!—উঃ! ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলা স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড-সবুজ নিশান দুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্‌ন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন. গাড়ী, লোকজন!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়ী আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত আড়ষ্ট পায়ে পায়ে স্বামীর পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশেহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোট-গাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রের গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে একগাড়ীতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কাম্‌রায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখ্‌খুনি চোখে কয়লায় গুঁড়া পড়বে—

কয়লার গুঁড়া তো নিরীহ জিনিস, চোখ দুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল— সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা হুস করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ীখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সাম্‌নে খুব উঁচু একটা কালোমত ঢিবি, ঢিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশের সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন, লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল!—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেনবাবুর কাছে ঘড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরণের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে যে কেন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে—উঃ! রেলগাড়ী কি জোরে যায়! —কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব কোন্ দেশের উঁচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকান্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্‌ন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন্ স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্‌লাগানো মত—তাহারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট নম্বর?....হাঁ আচ্ছা—সিক্সটি নাইন্—সিক্সটি নাইন্—হাঁ?....উনসত্তর....ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক্ হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বল্‌চে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের উপর গাড়ী উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরণের তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চ-লতা পাওয়া যায় তো?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্বপরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যেসব জায়গায় ছিল, এখন সেসব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশেপাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনো সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর-দেবতা! এত ঘরবাড়ী! আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?—অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপ-ধূনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশ ভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রাণী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরাণী। দামী বারাণসী শাড়ী পরনে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মত জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু কি মুখশ্রী—সত্যিকার রাণী সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে! তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে, কি ঠাকুরের আরতি বেশিক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়ীই বা কি!....দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলীবাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদের নাটমন্দির, দো-মহলা বাড়ী, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল—দেখেচিস্ বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?—এখন সে যেসব বাড়ী রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলীবাড়ী—

এত গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত ধরণের! আসিবার দিন রাণাঘাটে নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু-চাকার গাড়ীই যে কত যায়!....তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দুদন্ড এইসব দ্যাখে—কিন্তু পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এরকম কান্ডকারখানা সে কখনো কল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাহাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশী দূর নয়, রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহাউৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে—তার নাম পল্টু, ভাল কথা কহিতে জানে না, ভারী চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য,

সে জ্ঞানই তাহার নাই। আসিলে সর্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—এক্‌লা এক্‌লা ওরকম যাস কেন? শহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস?....মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দুবেলা অধ্যবসায়সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য যোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখন্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নতুন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্যবাড়ী গিয়া কত ব্রতপার্বণ উপলক্ষ্যে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান শুরু করে—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুন্ডলাক্রান্তগন্ডং।
....স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং
....ব্রহ্মগোপালবেশং।

ভিড় মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে, কথাকতার মতও থাকবে, নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষর-পরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়.... আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ' আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়....শুন্‌বে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে—ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি —তা কি দেবে?

—তুমি কোন্‌খানটায় ব'সে কথা বলো বল তো? একদিন শুন্‌তে যেতে হবে—

—যেও না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নূতন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে, দিনটা ভালো—

—আস্‌বার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপী এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পুজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপী, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাব্‌লাম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোষে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি বারের পূজো? উনি বাড়ী আসচেন দেখ্‌লে, হাঁ ঝি? চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই দ্যাখ্ তোর সেই নারকেলের ফোঁপল—তুই ভালবাসিস্? কিশ্‌মিশ, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস্, আয় খাবি, দিই—বোস্ এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে লোকের কান যে ঝালাপালা হোল, নতুন একটা কিছু ধরো না? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত—বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্চে বুঝলে? ব'সে ব'সে শুনলাম, বুঝলে? ....সোজা পদ সব....কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হয়ে—নতুন ধরণের পালা বাঁধবো—এরা সকলে গায় সেই সব মান্ধাতা আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বলছিলাম—

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক-একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দিষ্ট কোন্ আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মত হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!....

ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোক খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারী তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?—"কবির গুরু ঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাঁঙাগড়া করিয়াছে—তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে নূতন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াসার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সী সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনো স্কুলে পড়ে নাই। নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সীদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পল্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন, তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ী আছে?

পল্টুর দাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—শিষ্য-বাড়ী? কিসের ভাই?....

অপু সদুত্তর দিবার পূর্বেই সে বলিল—আমার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

এক-একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণপাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা এ পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী মন্দিরে পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহূগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষ পূরবী সুরের আশীর্বচনটি তাহার ভারী ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ....

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘন্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মূর্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্যং?

হরিহর খুশী হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনিস্ খোকা?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—ষষ্ঠীর মন্দিরের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভাল লাগে?

—খু-উ-উ-উ-ব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে নাকি?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পণ্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে, কাশীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষতঃ তাহার সুন্দর মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের রাণায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কান্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—মাসে মাসে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হোলে পরে পনের সের আধমণ ক'রে চাল পড়তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে আর ভেজে না—চালের তো একটা দানাও না—এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি!....মশায়ের শিক্ষা কোথায়?

—শিক্ষা তো ছিল এই কাশীতেই অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি....

—মশায়ের বাসা কি নিকটে? ....একটু চা খাওয়াতে পারেন?....কদিন থেকে ভাব্‌চি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরম জল করিগে.... গলা বসে গিয়েচে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা....

—হাঁ হাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা—চলুন না? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ায় পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরী হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবীতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ, বেশ ছেলে তো আপনার? ভারী সুন্দর দেখতে —বাঃ—এস এস বাবা, থাক্ থাক্ কল্যাণ হোক—লোন্-চা করিয়েচেন তো মশায়?....দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসারই নেই তো ছেলেপিলে? ....দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাক্‌তো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!....এসব কি আর দেশ মশাই? ....বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্চে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই দু'কুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায়?

—সাতক্ষীরের সন্নিকটে—বাদুড়ে-শীতলকাটি জানেন? শীতনকাটির চক্কত্তিরা খুব ঘরানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান্ দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান—

—কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই—একটা বাগান আছে, দিয়ে আসি বিক্রি ক'রে—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা? ....তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম, —মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হোল কি জানেন? সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েচে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরী হয়ে—হাতে দিয়েচে কামড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেই বা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা করেচে—পাটুলির ঘাট পার হচ্চি—গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে—শিগ্‌গির বাড়ী যান মশায়—আপনার বাড়ী বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে ম'রে! —এই গেল ব্যাপার মশাই...জমিকে জমি গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন-চারশ টাকা যে আবার বিয়ে করবো? ....যাই বিশ্বনাথের ওখানে....অন্নকষ্টটা তো হবে না....আজ বছর আষ্টেক হয়ে গেল—এক খুড়তুতো ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক'রে ব'সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখ্‌খনো আমি যাবো না—করগে যা দখল। উঠি মশাই—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল? ....বেশ ছেলে, খাসা ছেলে—

পুরানো চামড়ায় তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামনভিক্ষে—দেখি কি হয়—

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা খট্ খট্ করিত, শুক্‌না। এ বাসার স্যাঁৎসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো-হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়ীঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা ওকথার পর বলিল— কৈ আপনার ছেলেকে দেখচি নে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই বোধ হয় বেরিয়েচে—

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েচে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালবাসে তাই এই দুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধেয় কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি, ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজী পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর এক টুকরো বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরো দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া পড়িয়া দেখিল, কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথকঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথকঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন! আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কত্তি ভারী পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন—রামধন, তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাব্‌চি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব—তুমি নেবে কি? তা ভাব্‌লাম সদ্‌ব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি. কাশীতেই থাক্‌বো, দেশে ঘরে থাকবো না, কি হবে জমি? তারপর চক্কত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ'তিনেক টাকা হাতে করেচি—করেচি জলাহার করে মশাই—আর শ'দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলুম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কত্তি মশাই-এর ছেলেরা মানবে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সইটই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বোলবো এই দ্যাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন—

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবার মাঘীপূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়ীতে, ঠিক মান মন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধ্যের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কি না। একটু সগর্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর দ্যায়, বেশ ভাল খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘী পূর্ণিমার দিন শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়", "বোলো বোম্" বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দেওয়া হিসাব লেখা। নমুনা ঃ—

সিয়ারসোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ ....৪্

মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ী ... ঐ ... ... ২্

ধারক লালজী দোবের একদিনের খোরাকী ... ৪।·

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকী পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার?

৪্ ৪ টাকা। ২্ ২ টাকা। ।· চার আনা, এখনকার ২৫ পয়সার সমতুল্য।

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনোপ্রকার লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কালে বর্ষতু পর্জন্যং" জানেন আপনি?

—কালে বর্ষতু পর্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে, কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুচ্‌রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেল্‌না, শিবলিঙ্গ মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচ দেখি! তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল। নীচু হইয়া দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরি করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শাল্‌পাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়ায়? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদ-গন্ধহীন বেগুনের ঘন্ট— শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিয়াছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল, কথকঠাকুর কখনো কিছু খেতে পায় না, আহা এই লাড্ডু তাই অমন ক'রে খাচ্ছে—ওকে একদিন মাকে ব'লে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো—

করুণা ভালবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনী বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদিশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুল্‌কীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—এই ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অন্ততঃ আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,—কি হয়েচে, এমন ক'রে ব'সে পড়লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—অপু আস্‌চে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল —আরে রেখে দাও, তোমার ব'সে ব'সে যত ঐ সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন শিশি হইতে ছড়ইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মত একটা ঔষধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুর ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে—আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন্ এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে —ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে-সোঝে না।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে—তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন-টলেন নাকি—না? —অপু বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস্ করে—

—বল্‌ছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস করি-টরি—বেশ লোক—

—করুক গে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্-টাস্ কেন? বিকেলে ওপরে ব'সে ব'সে কি করিস্?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এস, একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নীচু সুরে বলিল—এই দুমাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফার্স্ট বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা কাগজ ছাপিয়ে বার করবে এক মাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেরুলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দুটাকা কোরে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপ্‌বে বলেচে—দু'টাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে শুরু করে। ছেলে যে লেখে সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে—তুই লিখিচিস্ খোকা?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্যের—বাড়ী থাক্‌তে রাণুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়া আসুক, সেরে উঠে পঁথি করলেই ঠাকুর-বাড়ীর ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে—হ'লো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে ব'লে দিয়েচে, চার টাকা করে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ্ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—দ্যাখ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল....বালিসের তলা চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চি কলমের বান্ডিল আছে, ওইটে খোল তো?....কোণে দ্যাখ্ তো ক'টাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্স-খোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!...ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর....কূলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে—চারটে টাকা আছে বাবা!—হরিহর সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস্, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিস্‌নে।

অপু খুশির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বলগে যা তো—একবার এসে দেখে যান্—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠান্ডা লেগে হয়েচে, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া —ভাল নার্সিং চাই,—নীচের ঘরে কি এমনি করে থাকে! ....খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওযুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সরী হইতে ঔষধ আনিল।

বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নতুন বিপদে পড়িল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তাহার রান্নাঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা বলে। প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌঠাকরুণ্—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌঠাকরুণ! হাত হইতে সর্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে! ....ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘন্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠাকরুণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছতে গেলে....একটু চুন দাও তো! বোঁটা নেই?....আহা আঙুলের মাথাতে করেই একটু দাও না অম্‌নি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিক-ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণসুরে বলে—খোকা কৈ! খোকা কৈ! ....সর্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বস্‌বে....বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলো বলে—বসতে পারিস্‌নে একটু কাছে!....খোকা খোকা ক'রে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বস্‌গে যা, গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হয়ে স্বগ্‌গে ঘন্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিক বসিয়াই মনে ভাবে —ওঃ! কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কন্‌কনে ঠান্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছট্‌ফট করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রাণা, নির্মল মুক্ত হওয়া, সুবেশ নরনারীর ভিড়। পন্টু...সুবীর....গুলু....পটল—পন্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটায় আজ আবার বাচ, বেলা চারটার সময়! উস্‌খুস্ করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল্—হ্যাঁরে, ওই সাদা বাড়ীটার পাশে কোন্ ছত্তর জানিস?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিসনে বুঝি! খেয়ে আসিস না আজ? ....দেখেই আসিস্ না?

—কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অমনি ছত্তর থেকে খেয়ে আসি্‌স—বুঝলি!

বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল-ভিজা খাইতেছে।

—ভালো না—কুমড়োর একটা ছাই ঘন্ট—বসে ব'সে হয়রাণ—বড্ড ময়লা কাপড়-পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্তো নাকি? রান্না হয় নি?

—আজ তো আমার কুল্‌ইচণ্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি....খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়লের ডাল ভিজে খেয়ে দ্যাখ দিকি? বেশ লাগবে এখন—এবেলা রাঁধলাম না, ভারী তো খাস, এত কটা ভাত বসিস্ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পার্‌বি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে; নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল। এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ায় ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবুকে দেখিয়া সে জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। নন্দবাবু বলিল—পান সাজা হয়েচে বৌঠাকরুণ? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবিতে করিয়া সামনের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুন বড্ড কম হয় বৌঠকরুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়ীতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিবে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখ্‌খুনি ওপরে—কখ্‌খনো আর নীচে আসবেন না—নীচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নীচে নামে—এক আধ বার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ-ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দী বলিতে না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সূরযকুঁয়ারী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কম বয়সী, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল— কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েসীর ভাব দেখেন আমায় বলবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠান্ডা করিয়া ছাড়িব।....

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্বজয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি রৌদ্র আসিয়া সরু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মাল্‌সাতে গাঁদাফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়া ছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধ হয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁশ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া

যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক্ হইল, বাবার চোখের ও-রকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানাসুরে যেন কি একটা শব্দ হইতছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুলমাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেজে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল!—অপু, ও অপু ওঠ, শীগ্‌গির গিয়ে ওপরে থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্‌তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সূরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়া-লীলার মত চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াসা বোধ হয় বেলা হইলে রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালীটোলায় ঘোরাঘরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার-অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠান্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত-দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়ঃ....

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়।....

পথের পাঁচালী — দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা কিছুই আর

নাই। দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে-ঘাটে বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যদের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরি হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলদে রঙের বাড়ীটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরনের খুব বড় বাড়ী। সকলের পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সঙ্কুচিতভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নি সর্বজয়ায় সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক্, থাক্, এলো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে—কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কাশীতেই? না?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্তি হইল। রাঁধুনী সে একা নয়, চার-পাঁচজন আছে। তিন-চারটা রান্নাঘর। আঁশ নিরামিষ, দুধের ঘর, রুগীর ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়ীটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল রাঁধিতে পারে। সে বলিল, নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হ'লেই তো চিত্তির। পরে পাঁচি-ঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্‌চিস্ ও পাঁচি, কাশীর ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন! কি নাম গা তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্বজয়া সেদিন সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপি ফ্রিটার্স বলিয়া যে একটা তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হাল্কা কাজ দেওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে

বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথাও লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র!

রান্নার বিচার ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ড-কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—দু'বেলায় তিন সের ক'রে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘিএর খরচ!...পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চালের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বাম্‌নীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধরবে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাত করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদ্‌লি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নীচু, আর মেজে এত স্যাঁতসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। দেয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখচো মা, ঠিক যেন পুরানো চা'লের কি কিসের গন্ধ বল দিকি?...নীচের এ ঘরগুলো কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসনো। ঘরে ঘরে গদীআঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়ীতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেজেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকর-বাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল! বড় বড় গদী-আঁটা চেয়ার,—আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া রুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন্ বা?...কাহে ইস্‌মে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ীর একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বোলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখ্‌চে দেখুক না—

সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময় নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এসময় ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহুরাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল—কে, অপু! আয়—দোর ঠেলিয়া বাম্‌নী মাসী ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল—আসুন, মাসীমা বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বাম্‌নী মাসী বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বাম্‌নী মাসীর মুখ ভারী-ভারী। খানিকক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখলে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা...তুমি তো বরাবরই রুটীর ঘরে ছিলে? মাছ, ঘি এনে চুপড়ীতে ক'রে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি—কি রকম অপমানটা দেখলে তো একবার? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হোত। সদু ঝিও কি কম বদ্‌মায়েসের ধাড়ী নাকি?...গিন্নীর পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী ব'লে, যাই জলখাবারের ময়দা মাখিগে—

চারটে বাজ্‌লো—

মাসী চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ দুপুরে বল্ তো?...

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজচে মা—শুন্‌ছিলাম—ঐ বারান্দাটা থেকে—

সর্বজয়া খুশি হইল।

—হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?....তোকে ডেকে বসায়?....

—খুব-উ-উব!....

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বক্‌লে না? কেন বক্‌বে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভাল খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহারা এক চৌকা পিঁড়ির মত তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালিয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যারাম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া খেলাটা দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের আগমন শুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়লোকের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে। নীচের তলার দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারারাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নী বলিলেন—ও অপূর্বের মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান্ জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের রুটীর ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফল-ফুলুরী যা দেখবে পচ্‌বার মত, সদুঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়ত রেখে দিও, জলখাবারের সময় নিয়ে আসবে বাম্‌নী মাসী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝি-বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুনিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো-ষোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবু একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বাম্‌নী মাসীর হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালোমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্য কিছু—আহা, বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হয়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না এক হাতা দুধ—তখ্‌খুনি ঐ সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়া শহরের অন্য এক বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার কিছুপূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতদের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে শতরঞ্জি পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ্। বিলাতী সেন্ট্ ও গোলাপ জলের পিচ্‌কারী ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক! মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামী বেনারসী শাড়ী-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দুই দিন পরে শখের থিয়েটার উপলক্ষে আবার খুব হৈ চৈ। উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপার তো একেই অপুর তাক্ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটা কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে-ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর দারোয়ানেরা জরির উর্দী পরিয়া বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশী দেরি নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো, এখানে বাবুরা বস্‌বেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নাম্‌তা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্দে থেকে এইখানটায় বসে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি, কোথায় যাবো?.... তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সাম্‌নে বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেচেন মুখের কাছে বস্‌তে! কোথায় যাবো ওঁকে ব'লে দ্যাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ওই থামটার কাছে বস্‌গে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্মকর্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোক্‌রা বাবুদের এখানে এসে ব'সে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসবার জায়গা নেই—উঠ্‌তে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক!

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—দাও না দুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোন জায়গায় ছুটিয়া পালায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে, অপমানে, লজ্জায়, তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল....কিন্তু চারিধারে চাকর-বাকর, ওপরের বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েরা, ঝি-রাঁধুনীরা নীচের বারান্দায়

দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা! সে বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনোদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে! কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলে ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

পথের পাঁচালী — ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক্, দুঃখে হৌক্, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিণী, বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে!—ছোটর ছোট তস্য ছোট!.....এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছ বলিয়া সামনে সামনে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?.... বাইরে যাইবার সুবিধা কৈ? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?....

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বামনী মাসীর মত?...

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ, সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী পিছনের গেটে আসিতে শুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া কেহ ধীর, কেহ ক্ষীপ্র, কেহ সুন্দর অপূর্ব গতি-ভঙ্গীতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুণ সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া-মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক-একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মনি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না? অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছটা থেকে....বেরুনো তো সোজা নয় ভাই, সব তৈরী না হলে তো....জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রংএর দামী চায়না ক্রেপের হাতকাটা জামার ফাঁকা দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সাম্‌নের মাসে যাবেন কল্‌কাতা—বুধবারে মা গেছলেন যে—ঠিক কিছু হোল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপারং-এর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্ চিক্ করিতেছিল, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে- আলতা রং এর আভা অপূর্ব। মাসখানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির ওপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো ক'রে....কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অব্‌ধি....

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইঁহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামী পুষ্পসারের মৃদু মনমাতানো সৌরভ, বীণার ঝঙ্কারের মত সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?....

মেজ বৌ-রাণী অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড়লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। দু'ধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা, এস উঠে। দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কোত্থেকে আস্‌চ?....

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রাণী ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিটেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আস্‌চ খোকা?....

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আমার মা—এই বাড়ী থাকেন— সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে।....

মেজ বৌ-রাণী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা?....কে বল তো....কি করেন? কতদিন তোমরা এসেচ?

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রাণী বোধ হয় ইহাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেচ বুঝি?....কি নাম তোমার?—তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এস—

অপু চোরের মত বৌ-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে মেয়েদের বড় মজলিশ, সারা বারান্দাটা কার্পেট-মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গ্যানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু'একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে একটি গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারী সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারী সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাঁহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজলিশ চলিতেছে, এমন সময় নীচে এক হৈ চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!....কাণ্ড দ্যাখো....হি হি....বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে....হি হি....।

দুই-তিনজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েচে রে? কি?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে....লুচি ভাজতে গিয়েচে....সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে বসে লুচি ভাজচে....বলে আমি বাইরে থেকে একবার....হুঁকোর মধ্যে....হি হি....নিয়ে যাচ্চে পুরে চুরি করে....আধসেরের ওপর....গোমস্তা মশায় ধরেচে....রামনিহোর সিং মার যা দিচ্চে....চুলের ঝুঁটি না ধরে—

সর্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দু মণ মাছ ভাজার ভার তাহার একার উপর—সকাল আট্‌টা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পাতলা ময়লা রংএর, ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু-তিনজন মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অদ্যকার কার্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতর ঘৃত পাওয়া যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, সে অস্ফুট স্বরে বাবা রে বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্‌ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় রক্তও বাহির হইল।

সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ক্ষেমিমাসী?....আহা ওরকম ক'রে মারে?....বামুনের ছেলে....

ক্ষেমি বলিল—মারবে না! হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে....মারার হয়েচে কি এখনো...পুলিশে দেবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি-চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নীচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া—এ উহার পিঠে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসী? ক্ষেমি ঝি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কি বলিল— কোথাকার রাণীমা—সর্বজয়া ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নী কাহাকে বলিলেন—খিড়কীর ফটকে ইঁহার পাল্কী আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই-তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ীর ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড়লোক, এরা যখন এত খাতির করছে, তখন তো যে সে নয়......! বৃদ্ধার যোল বেহারার প্রকাণ্ড পাল্কীটা খিড়কীর ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহার দারোয়ানেরা পাল্কীর সামনে পিছনে দাঁড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যানা মেয়ের উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসীমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বললেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারী, দুলাখ টাকা দান করেছেন, বাঙাল দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি....ওদের তো আপনার লোক....গেরাজ্জি করে কেউ!

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিন মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়েসের—সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাক্‌রুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা,

ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু....

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নাম কি,—অপু না কি?

অপু বলিল—অপু ব'লে ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্বকুমার রায়....

সে একটু অবাক্ হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ! রাণুদি, অতসী-দি, অমলাদি, সকলেই দেখিতে ভাল বটে কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বেকার ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ বৌ-রাণীর মত সুন্দর কোনো মেয়ের কল্পনাও সে করে নাই। লীলাও মায়ের মত সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়ের মজলিশে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী? সেবার এসে তো দেখিনি?

—আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুন মাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখানেই মারা গেলেন কিনা—তাই—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল!

লীলা বলিল—চল, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাস্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বারে, বল্‌চি তো চল, তুমি তো ভারী লাজুক?—এস—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?....

ঘর বেশী বড় নয় কিন্তু সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিল দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চার-পাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটাসি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই দ্যাখো আমার জলছবি, মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন, ভাগ শিখলে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না?

—তুমি জানো? ভাগ কষেছ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল—কবে!...

এই ভঙ্গিতে অপুর সুন্দর মুখখানি আরো ভারি সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি? তিল? বেশ দেখায় তো তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত? তেরো? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দুবছরের ছোট—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

—বলো দিকি?

লীলার গলার সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোন মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,
তাকে খাট-পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারী মজার কথা জানো তো? এমন হাসাতে পারো তুমি!....

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বলবো? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বই এর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্‌টা হইতে কলম বাহির করিয়া বলিল—বল দিকি?

অপু আবার বলিতে শুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক্ হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো লিখেচ কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউন্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপুর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই দ্যাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ বেশ তো! দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক্ হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

—উঁহু—

—কেন?

—নাঃ!

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস!...ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউন্টেন পেন দেবার জন্য? কেউ বক্‌বে না, আমি মাকে বলবো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো—বাবার ফটো দেখবে?...ওই ক্যালেন্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু-তিনখানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাস্টার মশায় কিনে দিয়েচেন—তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়তাম এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরি করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি?

লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারিতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিশের ওয়াড়, আল্‌নায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্ব্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই দ্যাখো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনখানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া বলিল—বেশ তো হয়েচে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপুর ভারী লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

—নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাস্টারবাবু ব'সে ব'সে হয়রান, আমি ওপর নীচে সব ঘর খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্ছি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে—তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয়? উঁহু-হু কি গন্ধ আসছে দ্যাখো—এস দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বল্‌গে যা—কে তোকে বলচে এখানে বক্‌বক্ করতে? যা মাকে বল্‌গে যা—

ছোট মোক্ষদা খর্ খর্ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেজেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর-টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও প'ড়ে দেখলেন। অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ বোধ হইল। মেজ বৌ-রাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন।

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, সখা-সাথী বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে—অপু আল্‌নার দিকে চাহিল। তাহার ভাল কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গীতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি! না বল্লে আর হাঁ হ'বার যো নেই বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও, বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন? কি হয়েচে বলো—না বল্‌তেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আল্‌নার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আল্‌নার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউন্টেন পেনে লিখচো? কেমন, বেশ ভাল লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দুজনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুই জনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বই এর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মত চিক্‌ন নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে করে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ! লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্—ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্ধেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারী খোশামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম? আমাদের মূলতানি গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ লক্ষ্মী ছেলে? ভারী ইয়ে কি না? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ, না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

—আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বল্লে জলছবি তুল্‌তে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকম অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বাম্‌নী মাসী নাড়ু ভাজিতে সাহায্যে করিল, দু'একজন রাঁধুনী-বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্জি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো মুকুল পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি। ব'লে গেলে সোমবারে আস্‌বো কল্‌কাতা থেকে, কত সোমবার হয়ে গেল—ফিরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আস্‌বো কি ক'রে? স্কুলে ভর্তি হয়েচি, বাবা দিয়েচেন ভর্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকাতার বাড়ীতেই থাকব কি না? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম—আবার বুধবারে যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাক্‌বে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আসবো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু?

অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল দেশী ধুতি-চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েচেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি-চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবিটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা এ বাড়ীতে পা দিবার পূর্বে অপু চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদ্‌লে গিয়েছে? আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বিঁধতে লাগলো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়ের পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপু একখণ্ড মুকুল দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্ন পুর্ণজাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্যন্ত অনেক খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারী খুশী হইয়াছে।

বলিল—কেউ বার কর্তে পারেনি—কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ— পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা-রূপা....এক পাউণ্ডে তের টাকা—গুণ করো দিকি?* তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো এত টাকা!····আগেও সে

* ১৯২৮ সালের হিসাবে এক পাউন্ডের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ টাকা।

আঁকটা একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল—আমি বড় হলে যাবো— দেখ্‌বো গিয়ে—ঠিক বার কর্‌বো দেখো—কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

—এই দ্যাখো লিখেচে "পোর্তো প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে"—খুঁজে বার করবো।....

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্য্যন্ত থাকিলে হয়!....

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিনবো, বড় হোলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কলকাতা গিয়েচ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কখ্‌খনো—খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের—

কাশীর চেয়েও বড়?

—কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে অপু হাসিয়া বলিল—উঃ বড় সুড়সুড়ি লাগ্‌চে।

লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বাঁ-ধারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে স্কুল। জনপাঁচেক মাস্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আস্‌বাব। স্কুলের সাম্‌নেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুনবালির কাজ-বিরহিত নগ্ন ইঁটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ্ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না, শহরের এই সব ইঁট-সিমেন্টের কান্ড-কারকানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুর্কীর পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের

বেশী উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই একসঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে ইট-সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয় এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মত ! কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক-একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়ো খাতাঞ্জি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সাম্‌নে করিয়া বুড়ো সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরিশ গোমস্তা জমাসেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্জিখানার মত অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোশের নীচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরী হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাদ্যকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?...তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়ে উঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডালাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝক্‌ঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল—ঠেলচি, আমায় একবার চড়্‌তে দেবেন তো?

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল্ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল—আমি এট্টু চড়বো না?

রমেন বলিল—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও-বেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়্‌তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেল্‌লাম—বেশ তো ! সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—

রমেন বলিল—ঠেল্‌লি কেন তুই, না ঠেল্‌লেই পাত্তিস্—যা—কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে না?

সে বলিল—কেন আপনিও বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ফু-র্-র্-র্,—বক দেখেচ?

কোনও কিছু না হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমরা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিক আসিস্ কেন খেলতে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুণই হউক বা সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্যই হউক—অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারী করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশ দিক হইতে দশ ঘটি জল···· বাতাস···জলপটি, হৈ-হৈ কাণ্ড!

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন—কৈ, কে মেরেচে দেখি? রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

বড়বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাকরুণের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভারী বদ্ ছোক্রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেচে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়, স'রে বস্তে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়েসেই তৈরি—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন—সকালে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—ও-ই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিজ্ঞেস করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরাজী ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখতে চায়—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়েচেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, শখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন। —স'রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর তোমার বয়স কত জান?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবু—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গর্জন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড়, ডেঁপো ছোক্রা—কে তোমাকে বলে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূর্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্ধা আর না

হয়, বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামী ।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ী বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ কান ধ'রে তক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আন্‌লেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক— দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে— এরপর কোকেন খাবে—মা'র বাক্স ভাঙবে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সব কথা গিয়া পৌছয় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজয়া শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওরকম যদি গুণ্ডা ছেলে হয় তা হ'লে বাছা—ইত্যাদি। রুটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ী থেকে আস্‌বে তখন রাত্রে তোমায় একদিন এমন ভয় দেখাবো?...তাহার কি কোন বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। ...

অন্ধকার রাত...আকাশে দু'একটা তারা জ্বল্ জ্বল্ করে—আস্তাবলের মাথায় আমলকী গাছের ডালে বাতাস বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুট চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—

—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সর্‌লে আমি স্থির থাক্‌তে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও, ঠাকুর ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পার্‌বো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারী হইতে হইবে। অপু ভারী খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভাল খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফারী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসিলটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌরাণীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ সখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলাভাজা কিন্‌লে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়; কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে যা-তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নেই। থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল।

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ী ফিরিতেই দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানলার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারী চমৎকার, শুনিতে শুনিতে—স্কুল, খেলা, রেফারীগিরি, ওবেলার মার-খাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনা-আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারের উলুখড়ের মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল-চারা, তাহাদের পিছনে কত দূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল-চারা যেন আঁকা, শুক্‌না ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হু-উ-দূরের দেশটা— কোন্ দেশ তাহার জানা নেই, মাত্র মনের খুশিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপু—উ-উ-উ-উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে?

সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাপ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস্ এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে নাকি—বকেচে?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে তাই বড়বাবু ডেকে বল্‌ছিলেন কি হয়েচে, —তাই—

—বকে-টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাব্‌চি, এখান থেকে চ'লে যাবি?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল— কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পূজো করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাক্‌বো না—

সর্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বলচিস্, কি আর আছে বল্ দিকি সেখানে? এক বাড়ীখানা তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে এ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোঁজাবার জায়গাটুকু নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া...খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ ক'ল্লে হয়, চল্ বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোন যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে!

উঃ কি গরম। রান্নাবাড়ীর নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ....ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার...আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দী বুলি বলিতেছে...পাথর-বাঁধানো মেঝেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ...ড্রেনের সেই গন্ধ...তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল। ....এখন একটু শুয়ে নিই, এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটে তিনটে বেজেছে—এখনও বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই তাহার বার বার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়েই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না—সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মায়ের ও বড়বাবুর কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না?—কখনো না?—কখনো না?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে?

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাঁধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই... সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে...খুব, খুব মাটির ভিতর...নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে...বেশ আরাম...মাথা ধরা নাই, বেশ আরাম।...

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রোদ্দুরে চড়ুই-ভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি?

রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের চলে না যে? রাণু-দি না লীলা?

হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে...ভারী চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?...

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখ্‌তে দিস্‌ খোকা?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথকঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র—পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবিটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে-ভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না...সে চলিয়াছে...চলিয়াছে...সে আর মা...এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না...ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে দ্যাও না আমাদের? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হাঁরে, ওঠ্‌, ও অপু, বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেলতে যাবি?—ওঠ্‌-ওঠ্‌।

সে মায়ের ডাকে ধড়্‌মড় করিয়া বিছানায় উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল—উঃ কি বেলাই গিয়াছে!..রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে? তাহার মা বলিল—বললি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কৈ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের্‌ করে?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেফারীগিরি করিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে অন্ধকার! উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। এক অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা , ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি-ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে, নিশিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়ো ভিটার মিষ্টি লেবু ফুলের গন্ধে সজনেতলায় ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক?

এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুল তলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণে তাহার অভ্যাসমত অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চাল্‌তেপোতার বাঁকে নতুন কষাড় বনের ধারে ধারে অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ী পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোনো রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হল্‌দে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।...

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটায় উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে.... কেহ কোনোদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়ু-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে....দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গন্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে....

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়....তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না....চলে..চলে....চলে.....এগিয়েই চলে....

অনির্বাণ তার বীণা শোনা শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!....

চল এগিয়ে যাই।